# রবীন্দ্রনাথ

# নজরুল জীবনানন্দ

ইন্দুভূষণ দাস

পরিবেশক

[illegible] । ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

শান্তির নীড় রচনা করিবে ভুলিয়া সুখের আ

পাথেয় করিবে অচেনা জীবনে ক্ষমা আর ভালো

স্নেহের ইলাকে তার বিয়েতে

ইতি -

'তারাদি' আর 'অস্মরনীয় 'দাদাবাবু'.

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-পরবর্তী দু'জন অগ্রগণ্য কবির জীবনী একত্রে এই প্রথম প্রকাশিত হলো। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বইখানি সমাদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

—প্রকাশক

# রবীন্দ্রনাথ

॥ বাংলা ও বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ ॥

পূর্ববঙ্গের কুশারী বংশের একটি শাখা কবে এবং কিভাবে কলকাতায় এসে 'ঠাকুর পরিবার'-এ পরিণত হলো সে প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আলোচনা করছি না। অথবা, বাংলার সাহিত্যে শিল্পে কিংবা রাজনীতিতে এই পরিবারের লোকেরা কে কতখানি অংশগ্রহণ করেছেন, অথবা, কার কতখানি অবদান সে-কথাও আমাদের আলোচ্য নয়।

আমাদের এই আলোচনা একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ বাংলার বুলবুল, বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথেব মধ্যে, যিনি বাংলাকে ভালবেসে লিখেছেন ঃ

> "আমার সোনার বাংলা
> আমি তোমায় ভালবাসি ;
> চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
> আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

সত্যিই বাংলার আকাশ-বাতাস বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণে বাঁশি বাজিয়েছে। তাই বাংলার প্রমত্তা নদী পদ্মার তীরে বসে কবি লিখেছেন ঃ

> "আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
> হাসিছে বন্ধুর মতো! সুন্দর বাতাস
> মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
> অদৃষ্ট অঞ্চল যেন মুক্ত দিগ্‌বধূর
> উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
> প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
> প্রবল কল্লোল।"

আবার খরস্রোতা কুলধ্বংসী কীর্তিনাশা পদ্মার কথা স্মরণ করে কবি লিখেছেন ঃ "কীর্তিনাশা মানবের ভীষণ শিক্ষক।"

পদ্মা একান্তভাবেই বাংলার নদী। পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভগীরথ যখন সগর বংশকে উদ্ধার করবার জন্যে তপস্যা করে গঙ্গাকে ভারতে নিয়ে আসছিলেন,—

"আগে চলে ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া,
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা বেণী দোলাইয়া।"

সেই সময় কোন এক শঙ্খচূড় নাকি ভগীরথের রূপ ধরে শঙ্খ বাজিয়ে গঙ্গাকে ভিন্নপথগামী করে—এবং সেই ভিন্নপথগামিনী গঙ্গাই পরবর্তী-কালে পদ্মা নামে খ্যাত হয়।

পুরাণের এ কাহিনী পুরাণের মধ্যেই পুরানো হয়ে থাকুক, আমরা বলি, শঙ্খচূড় বেঁচে থাক বাঙালীর হৃদয়ে; পদ্মাকে এনে দেবার জন্যেই সে বেঁচে থাক।

আবার ভূগোল বলে যে, "রামপুর বোয়ালিয়র কিছু উজানে গঙ্গা হইতে একটি শাখানদী উৎপন্ন হইয়া রাজসাহী জেলাকে পাশ কাটাইয়া এবং পাবনা ও ফরিদপুর জেলাকে বিভক্ত করিয়া পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া যমুনার দেহের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে।" এই নদীই হলো পদ্মা। বাঙালীর কাছে পদ্মা অনন্যা। বাঙালী কবির কাছেও তাই পদ্মা অতুলনীয়া। তাই পদ্মার রূপ বর্ণনায় কবি লিখেছেন ঃ

"বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে—"

আর এক কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"উলঙ্গ বালক তার
সানন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে; ধৈর্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-জ্বালাতন।"

বাংলাকে, বিশেষ করে বাংলাদেশকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি ভালবাসতেন, সে-কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন ঃ

"আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি দেশের সত্যিকারের রূপ কি তা অনুভব করতে পেরেছি। তখন আমি পদ্মা নদীর তীরে গিয়ে বাস করছিলাম.....

সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এইসব অসহায় অভাগাদের প্রাণে 'মানুষ' হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি।"

এই চিন্তাধারারই প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর আর একটি কবিতায়, সেখানে কবি লিখেছেন ঃ

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করোনি।"

বাঙালীর অশিক্ষা আর দুঃখ দৈন্য দেখে তাঁব প্রাণ কেঁদেছে, তাই তিনি সখেদে বলেছেন ঃ

"এই যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই যে এক বিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই ?"

কবির এই মানসটি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কবিতায়, যেখানে তিনি লিখেছেন ঃ

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এইসব শীর্ণ শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

রবীন্দ্রনাথের এই কবিসত্তার কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবী। তিনি লিখেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা, যাকে তিনি বলেছেন 'মানসী, কৌতুহলময়ী, জীবনদেবতা'—সে প্রতিনিয়ত তাঁর লেখনীকে টেনে নিয়ে গেছে এক লোকাতীত দিব্য অনুভূতির স্তরে, সেখানে

এই লোকসংসার তার সমস্ত তীব্রতা আর তীক্ষ্ণতা নিয়ে উপস্থিত হতে পারত না, হার মানতো। হার মানতেন কবি নিজেও। তাই হতাশ-বিস্ময়ে বলেছেন সেই কৌতুকময়ীকে—

"আমি যাহা চাই বলিবারে,
তাহা বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে বসি আছে,
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা নিয়ে কি যে কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে,
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।
... ... ...
বলিতেছিলাম বসি আঁধারে,
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত।
তুমি সে ভাষায় দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাষায়ে নয়নের জলে,
নবীন-প্রতিমা নব-কৌশলে
গড়িলে মনের মত।"

কবি রবীন্দ্রনাথ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তাঁর কবিতা আর গানের মধ্যে, কিন্তু ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন পল্লী-প্রকৃতির প্রেমিক উপাসক—পল্লী-মানুষের কাছের মানুষ।

আর, এই পল্লী হলো ওপার বাংলার পল্লী অঞ্চল এবং পল্লীবাসীরা হলো ওপার বাংলার পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা।

অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বকে আপনার করে নিয়েছিলেন; তিনি তাই শুধু বাংলার বা ভারতের কবি নন, তিনি বিশ্বকবি। এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন রকম মতবৈষম্য না থাকলেও রবীন্দ্রনাথকে ওভাবে দূরে ঠেলে দিতে আমাদের মন চায় না। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বাংলা তথা বাঙালীর কবি; তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের একান্ত আপনার জন—আমাদের একান্ত প্রিয়।

কেউ কেউ এমন কথাও বলে থাকেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী নন, তিনি কল্পলোকের রঙিন পাখ্‌নায় ভব করে স্বরচিত মনলোকে বিচবণ করেন। এদের মন্তব্য মেনে নিতে আমরা রাজি নই।

হয়তো তিনি কঠোর বাস্তববাদী নন, নিজের সমস্ত সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে তিনি নিজেকে বাস্তববাদী করে তোলেননি; কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কখনই অবাস্তব কবি বলে স্বীকার কববো না; বরং তাঁকে যাঁরা বাস্তববাদী নন বলে অভিমত প্রকাশ করেন তাঁদের আমরা অনুরোধ করবো তাঁরা যেন রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এবং পল্লী-বাংলার ওপরে লেখা তাঁর কবিতাগুলি ভাল করে পড়ে দেখেন।

এই প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন ঃ

> "পদ্মাতীরের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তাঁর চিঠিপত্রে আছে। নানা জনের কাছে ঐ সময়ে তিনি নানা প্রসঙ্গে চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে 'ছিন্নপত্রে' আমরা সেই পদ্মাতীরের সীমাহীন সৌন্দর্যের আলোকসুধা পান করে কবির অন্তরের গভীর অনুভবের সঙ্গে আজো যুক্ত হই। প্রথম আটখানি ছাড়া 'ছিন্নপত্রে'র আর সমস্ত চিঠিই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা। এই চিঠিপত্রগুলির রচনাকাল আট-নয় বৎসরব্যাপী। কবির বয়স তখন পঁচিশ থেকে তেত্রিশের মধ্যে এবং ইন্দিরা দেবীর বারো থেকে যথাক্রমে তদূর্ধ্বে। উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে

থেকে শহরবাসিনীকে লেখা এই চিঠিগুলির মধ্যে কবির নিগূঢ় স্বরূপ যেমন অভিব্যক্ত, এমনটি বোধ হয় আর কোথাও হয়নি। বিশেষত ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ কাব্যে ব্যক্তিগতভাবেই প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব ছিল না, যখন জীবন ভোগের মন্থনোদ্ভূত রস সকলের হয়ে উঠত তখনই তা কাব্যের যোগ্য বলে সাহিত্যে স্থান পেত। তাঁর জীবনটি স্পষ্টভাবে তাই কাব্যে পাই না।”

কাব্যে তাঁর জীবনকে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না বলেই বিভিন্ন সমালোচক তাঁকে বাস্তববাদী নন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

“ছিন্নপত্রে’র মধ্যে তিনটি বিশেষ ধারা আমরা পাই, একটি বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া ছবি, আর একটি বাংলাদেশের সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি। তৃতীয়—এই দুই-এর সঙ্গমে উদ্ভূত কবির মনন ও তত্ত্ববাণী।······

বাংলাদেশের খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরের বড় কাছাকাছি এসেছিলেন কবি। পদ্মার জলে ভাসছে তাঁর নৌকা, তিনি দেখেছেন দু’পাশের জীবনসীমা— কখনো বা কল্পনায় একেবারে তাদের সুখ-দুঃখ ভোগ করছেন। কোন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে জলভরা চোখে নৌকায় উঠল, তার ভবিষ্যৎ কল্পনা গল্পের বীজ বুনছে। কোথাও বা শীতকালের ভোরে ক্রন্দনরত শিশুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করাতে চড়-চাপড় মারছে ধৈর্যহীনা জননী। শীতার্ত শিশুর সেই আর্তস্বর আর্ত করে তুলেছে তার সুন্দর সকাল—

‘একে এই ভোরের শীতে কনকনে জলে চান তারপরে আবার রাক্ষসীর হাতের মার।’ এই চিঠিগুলি পড়তে পড়তে গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের আলো-ছায়া আজও স্পষ্ট হয়ে ওঠে —কি আশ্চর্য সহৃদয় দৃষ্টিপাতে কবি দেখেছেন সুখ-দুঃখমাখা. হাসি-কান্নাভরা মানুষের বড় ভালোবাসার জীবন। আর

দেখেছেন নদী-খাল-বিল-তাল-নারিকেল কুঞ্জ। অবাধিত প্রান্তরে সূর্যোদয়ের ও অস্তের সমারোহ, মাথার উপরে শুধু নীলাকাশের জ্যোতিঃবিকীর্ণ মহোৎসব—"

এই হলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ। বাঙালীর একান্ত প্রিয় বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ। এই কবিব কথাই আমরা আলোচনা করবো এখানে।

তবে, এসব কথা বলবার আগে কবির জীবন-কথা সংক্ষেপে বলে নিতে চাই।

॥ সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ॥

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।

আমরা, অর্থাৎ হিন্দুরা ঠাকুরবাড়ি বলতে সাধারণত বুঝি দেবালয় বা মন্দির; অর্থাৎ যেখানে মৃন্ময় বা প্রস্তরময় দেবতারা বিরাজিত থেকে ভক্তজনের পূজার্চনা গ্রহণ করেন। কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সে অর্থে ঠাকুরবাড়ি নয়। ঠাকুর পরিবারের বসতবাড়ি বলেই জোড়াসাঁকো পল্লীর একটি বিশেষ বাড়িকে লোকে বলে ঠাকুরবাড়ি।

এই ঠাকুরবাড়ির পত্তন করেছিলেন নীলমণি ঠাকুর। ইনি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতামহ। দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ব্যক্তি এবং তাঁর একজন বিশেষ বন্ধু। রামমোহন যখন সতীদাহ প্রথা রদ করবার জন্যে আন্দোলন শুরু করেন, তখন দ্বারকানাথ অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁকে সমর্থন করেন। এছাড়া বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের ব্যাপারেও দ্বারকানাথের দান অপরিসীম।

রামমোহনের মত তিনিও বিলাতে গিয়েছিলেন। বিলাত হতে ফিরে এলে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন;

কিন্তু দ্বারকানাথ তাঁদের কথায় প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী হন না। তিনি বলেন, "আমি এমন কোন অন্যায় বা পাপ কাজ করিনি যার জন্যে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

দ্বারকানাথের আর এক কীর্তি হলো, ইংল্যাণ্ডে রামমোহন রায়ের সমাধিক্ষেত্রে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। এঁর ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মসাধনার জন্যে লোকে তাঁকে 'মহর্ষি' বলে ডাকতো। আসলেও তিনি মহর্ষিই ছিলেন। পুরাণে মহর্ষিদের যে-সব গুণাবলীর কথা উক্ত আছে, তার প্রত্যেকটি গুণই দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, এবং এই কারণেই লোকে তাঁকে মহর্ষি বলে ডাকতো। ইনিই আমাদের প্রিয় কবির জনক। মহর্ষির স্ত্রীর নাম সারদা দেবী।

## ॥ জন্ম ও বাল্যকাল ॥

আজ বাংলা মাসের যে বিশেষ দিনটি রবীন্দ্রজন্মদিবসরূপে পালিত হচ্ছে, সেই বিশেষ দিনটির সূচনা হয় ১২৬৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ (ইংরেজী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে) তারিখে। সেদিন ছিল রবিবার। এবং রবিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর নামকরণ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ।

মহর্ষির সন্তানের সংখ্যা ছিল পনেরটি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চতুর্দশ সন্তান।

ঠাকুর পরিবারটি সে সময় কলিকাতার অন্যতম ধনী পরিবার বলে খ্যাত ছিল। তাই বাড়িটি সব সময়েই লোকজনে পূর্ণ থাকতো। আত্মীয়-স্বজন, নায়েব-গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা এবং ঝি-চাকরে বাড়ি গম-গম করতো। এই পরিবেশেই বড় হতে থাকেন কবি। মহর্ষি তখন বাড়িতে কমই থাকতেন। বিরাট সংসারের দেখাশুনার ভার

ছিল সারদা দেবীর ওপর। তাই ছেলেদের দিকে তিনি নজর দেবার সময়ই পেতেন না; ফলে শিশু রবিকে থাকতে হতো চাকরদের হেফাজতে।

ঠাকুরবাড়িতে তখন শ্যাম নামে একটি চাকর ছিল। তার ওপরেই ছিল রবীন্দ্রনাথের দেখাশুনার ভার। কিন্তু শিশুকে দেখাশুনা করবার মত বাজে কাজে সময় নষ্ট করার চেয়ে আড্ডা আর ইয়ার্কি দেবার মত আসল কাজের দিকেই তার বেশি নজর ছিল। সে তাই ভেবে-চিন্তে একটি মোক্ষম পথ বের করে ফেললো। সে রবীন্দ্রনাথকে দোতলার একটি ঘরে বসিয়ে তাঁর চারপাশে খড়ির দাগের গণ্ডি এঁকে বলতো যে, এই গণ্ডির বাইরে এলে মহাবিপদ হবে।

কি যে বিপদ তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন না; তবে লক্ষ্মণের দেওয়া গণ্ডির বাইরে আসায় সীতাদেবীকে যে রাবণের হাতে ধরা পড়তে হয়েছিল, সে-কথা তিনি মায়ের মুখে শুনেছিলেন, এবং তা শুনে-ছিলেন বলেই তিনি গণ্ডির বাইরে আসতে ভীষণ ভয় পেতেন। তাই শ্যাম এসে তাঁকে মুক্তি-না-দেওয়া-পর্যন্ত তিনি সেই গণ্ডির ভেতরেই বসে থাকতেন

এমনি করেই শৈশবের দিনগুলি কাটছিল কবির। কিন্তু তাঁর বয়স যখন চার পেরিয়ে পাঁচ বছরে পড়লো তখন হঠাৎ তিনি মুক্তিলাভ করলেন শ্যামের গণ্ডি থেকে।

কিন্তু শ্যামের জেলখানা থেকে মুক্তি পেলেও আর এক জেলখানায় ঢুকে পড়লেন তিনি। এটি হলো গুরুমশায়ের জেলখানা। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় মাধব পণ্ডিতের কাছে। পণ্ডিত-মশাই তাঁর সমস্ত পাণ্ডিত্য প্রকটিত করে পড়ুয়াকে মানুষ করতে লেগে গেলেন। সে এক ভীষণ পড়া। সকাল থেকে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত চলছে তো চলছেই পড়াশুনা। পণ্ডিতমশাই ছাড়া আরও কয়েকজন মাস্টার নিযুক্ত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জন্যে। তাঁরাও প্রাণপণে পড়িয়ে চলেছেন ছাত্রকে। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, বিজ্ঞান

—সবই তাঁরা পড়াতেন। আবার পড়াশুনা ঠিকমত চলছে কিনা তার জন্যে খবরদারি করতেন কবির মেজদা হেমেন্দ্রনাথ।

এমনি করে এক বছর পড়াশুনায় তালিম দেবার পর রবীন্দ্রনাথকে ভর্তি করা হলো ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে। ওখানে বছরখানেক পড়বার পরে তাঁকে ভর্তি করা হলো নর্ম্যাল স্কুলে, এবং আরও কিছুদিন পরে বেঙ্গল একাডেমি নামে একটা ফিরিঙ্গি স্কুলে।

বেঙ্গল একাডেমিতে কিছুকাল পড়াশুনা করবার পর মহর্ষি তাঁকে বোলপুরে নিয়ে গেলেন।

বোলপুরে এসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম মুক্তির স্বাদ পেলেন। ওখানে তিনি নিজের মনে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। মহর্ষি এতে বাধা দিতেন না।

বোলপুরে কিছুদিন রেখে মহর্ষি তাঁকে আবার কলকাতায় এনে সেই বেঙ্গল একাডেমিতেই পুনরায় ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু এখানে পড়তে রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগতো না। তাঁর মনে হতো তাঁকে যেন জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। ববীন্দ্রনাথ তাই প্রায়ই স্কুল থেকে পালাতে লাগলেন।

খবরটা রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকদের কানে যেতে দেরি হলো না। তাঁরা তখন রবীন্দ্রনাথকে বেঙ্গল একাডেমি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু সেখানেও সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু হলো না। রবীন্দ্রনাথের দাদারা তখন রাগ করে তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তাঁর স্কুলের পাঠ এখানেই শেষ হলো।

## ॥ কবিতাচর্চা ও বিলাতযাত্রা ॥

কবিতার ওপরে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক দেখা যায় তাঁর শিশুকাল থেকেই। তিনি যখন সবেমাত্র অ আ ক খ শিখছেন, এই সময়

একদিন বিদ্যাসাগরের লেখা বর্ণপরিচয় বইটি পড়বার সময় ছোট্ট দুটি বাক্য পড়ে বিস্মিত হলেন। বাক্য দুটি হলো: জল পড়ে, পাতা নড়ে। 'পড়ে' আর 'নড়ে'—কী চমৎকার মিল! 'জল পড়িতেছে', 'পাতা নড়িতেছে' নয়—'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। মিলের দোলায় দুলে উঠলো শিশু-কবির কচি মন।

এবং সে দিনের সেই সুন্দর প্রভাতে কবির মনোদ্যানে যে জল পড়তে এবং পাতা নড়তে লাগলো, তাই হলো রবীন্দ্র-কাব্যের উৎসমূল। একদা মিলনরত ক্রৌঞ্চ-দম্পতিকে লক্ষ্য করে এক নিষাদ ধনুকে তীর সংযোগ করছে দেখে বাল্মীকি মুনির মুখ থেকে যে কবিতার উৎস নির্গত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে তেমন কোন কবিতা নির্গত না হলেও তাঁর মনোজগতে সেই 'জল পড়ে—পাতা নড়ে' যে মিলের মালা গেঁথে দিয়েছিল, উত্তরকালে সেই জল ঝর্নাধারার আকারে এবং সেই পাতা ফল-ফুল-পল্লবে সুসজ্জিত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে অনবদ্য কবিতারূপে।

রবীন্দ্র-জীবন-চরিত পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম জীবনে স্কুলের লেখাপড়ার দিকে অমনোযোগী হলেও কবিতা পাঠ এবং কবিতা রচনার প্রয়াসের প্রতি তিনি কোন দিনই অমনোযোগী ছিলেন না।

শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে শুরু করেন। শিশু কবির লেখনি হতে প্রথম যে কবিতাটি জন্মলাভ করে সেটি হলো:

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি
তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ
চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

কবিতা হিসেবে এর তেমন কোন মূল্য না থাকলেও, যে বয়সে

রবীন্দ্রনাথ আমসত্ত্ব কদলি আর দুধ দিয়ে এই অপূর্ব মিষ্টান্নটি তৈরি করেছিলেন, তাতে তার মূল্য যথেষ্টই রয়েছে বৈকি!

এই কবিতার পরেই শিশু কবি পয়ার ছন্দে কবিতা লিখতে শুরু করেন।

এর পর যতই তাঁর বয়স বাড়তে লাগলো ততই কবিতা লেখায় তাঁর হাতও ক্রমশঃ খুলতে লাগলো। তাই আমরা দেখতে পাই যে, কবির বয়স যখন মাত্র বারো বছর তখনই তাঁর কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওই সময়ে তাঁর লেখা একটি কবিতার নাম ছিল 'অভিলাষ'। তার প্রথম চারটি লাইন হলো ঃ

"জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।"

এই সময় কবির দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুরুষ বিক্রম' নামে একটি নাটক রচনা করেন। সেই নাটকে রবীন্দ্রনাথ একটি গান লিখে দিয়েছিলেন। গানটি হলো ঃ

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়—
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে বালক-কবির একটি গান আছে। ওই নাটকে রাজপুত নারীদের চিতায় আত্মাহুতি দানের একটি দৃশ্য আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই দৃশ্যের জন্য একটি বক্তৃতা রচনা করেছিলেন। সেই বক্তৃতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন—এখানে গদ্যের পরিবর্তে পদ্য লিখলে ভাল হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বললেন—তা তো বুঝলাম, কিন্তু পদ্যটি লিখবে কে? তুমি পারবে?

রবীন্দ্রনাথ বললেন—দেখি চেষ্টা করে।

ওই কথা বলেই তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা কবিতা লিখে দাদার হাতে দিয়ে বললেন—দেখ তো, এটা চলবে কি না।

কবিতাটি পড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খুবই খুশী হলেন। তিনি বললেন—নিশ্চয় চলবে। ওই দৃশ্যে এই কবিতাটি দিলে চমৎকার হবে। কবিতাটি হলো :

"জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥"

'সরোজিনী' নাটকের জন্যে এই কবিতাটি লিখবার পর থেকেই শুরু হলো রবীন্দ্রনাথের লেখা। এর পর তিনি 'বনফুল' নামে একটি সম্পূর্ণ কাব্য লিখে ফেললেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ষোল বছর।

'বনফুল'-এর পরেই লেখা হলো 'কবি-কাহিনী' এবং আরও অনেক কবিতা। পরবর্তীকালে ওই সব কবিতা সংগ্রহ করে 'শৈশব-সঙ্গীত' নামে একটি বই বের করা হয়। 'ভানুসিংহের পদাবলী'ও এই সময়েই রচিত হয়।

এই সময় একবার মাঘ-উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গান রচনা করেন। মহর্ষি তখন বাড়িতে ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডেকে তাঁর কবিতা শুনতে চাইলেন। কবি তখন হারমোনিয়ম বাজিয়ে অনেকগুলি গান গেয়ে বাবাকে শুনিয়ে দিলেন। কবির কণ্ঠে তাঁর নিজের রচিত গানগুলি শুনে মহর্ষি খুশী হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। সে পুরস্কার হলো পাঁচশো টাকার একখানা চেক। এই হলো রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের প্রথম স্বীকৃতি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুরবাড়িতে তখন প্রায়ই সাহিত্যিকদের

সম্মেলন হতো। একবার এমনি একটি সম্মেলনেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়।

আর একবার এমনি একটি সম্মেলন উপলক্ষে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকটি অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি।

এইভাবে সাহিত্য সঙ্গীত আর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে মহা-আনন্দে রবীন্দ্রনাথেরও দিন কাটছিল। কিন্তু এ আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। রবি লেখাপড়া ছেড়ে কবিতা লিখে দিন কাটাচ্ছেন শুনে তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের কাছে আমেদাবাদে নিয়ে গেলেন। তিনি তখন আমেদাবাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসন জজ।

এখানে আরও একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম আই. সি. এস্.।

সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী এবং তাঁর ছেলেমেয়ে সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা তখন ইংল্যাণ্ডে বাস করছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাই রবিকে তাঁদের কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাবার উদ্দেশ্যে বিলেতে নিয়ে যাবেন বলে মনে মনে স্থির করলেন।

এর পর তিনি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করলেন।

বিলাতে গিয়ে ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি করা হলো রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু সে স্কুলে বেশিদিন তাঁর পড়াশুনা হলো না। সত্যেন্দ্রনাথ তখন তাঁর লণ্ডনস্থ বন্ধু তারকনাথ পালিতের সঙ্গে পরামর্শ করে রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিলেন। লণ্ডনে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো ডক্টর স্কট নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে।

লণ্ডনে বছর দেড়েক পড়াশুনা করবার পর আবার দেশে ফিরলেন

রবীন্দ্রনাথ। এখানেই তাঁর 'অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার' শেষ হলো। এবং এর পরেই শুরু হলো তাঁর অনেক 'ক্যারিয়ার' অর্থাৎ কাব্য চর্চা এবং কবিতা ও গান রচনা। নিরলসভাবে অবিশ্রান্ত চলতে লাগলো তাঁর লেখনী।

॥ রবীন্দ্রসাহিত্যের বহুমুখী প্রকাশ ॥

রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদা তখন সস্ত্রীক চন্দননগরে বাস করছিলেন। বাড়িটা ছিল সুন্দর একটা বাগানবাড়ি। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ সেখানে এসে হাজির হলেন। কবি-ভাইকে পেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খুবই খুশী হলেন, এবং তাঁকে ওখানে কিছুদিন থেকে যেতে বললেন। রবীন্দ্রনাথও খুশীমনেই রাজী হলেন দাদা-বৌদির কাছে থাকতে।

ওই বাড়ির ওপরতলায় সুন্দর একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে বসে শুরু হলো তাঁর সাহিত্য-সাধনা। বর্তমানে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' নামে যে বইটি বিশ্বভারতী হতে প্রকাশিত হচ্ছে তার বেশির ভাগ কবিতাই চন্দননগরের ওই বাড়িতে বসে রচনা করেছিলেন কবি।

ওই কবিতাগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলোর বিশেষ প্রশংসা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে এবং কবি রবীন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখতেন তার প্রমাণ হিসেবে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

সেই সময় রামবাগানের দত্তবাড়ির সুবিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্তের মেয়ের বিয়ে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন সেই বিয়েবাড়িতে। কিছুক্ষণ পরে রমেশচন্দ্র একছড়া মালা এনে বঙ্কিমচন্দ্রের গলায়

পরিয়ে দিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশবাবুর হাত থেকে মালাটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—“এ মালা এরই প্রাপ্য।”

এর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চন্দননগর থেকে কলকাতায় এসে সদর স্ট্রীটে বাসাবাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে বাস করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সে-বাড়িতেও ছিলেন। ওই বাড়িতে বসে রবীন্দ্রনাথ যে সব কবিতা লেখেন সেগুলি এখন ‘প্রভাত-সঙ্গীত’ নামে সুপরিচিত। ওখানে থাকাকালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ রচনা করেন।

এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ কারোয়ারে বদলি হয়ে এসেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী ও ছোটভাই রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে তাঁর বাড়িতে কিছুদিন বাস করেন। ওই বাড়িতে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কাব্য ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ রচনা করেন।

কারোয়ার হতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তাঁর বয়শ তখন তেইশ বছরের কাছাকাছি।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের কিছুদিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লোয়ার সারকুলার রোডে একটি বাড়ি ভাড়া করে বাস করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে সেই বাড়িতে ছিলেন। এই সময় তিনি যে-সব কবিতা রচনা করেন সেগুলি ‘ছবি ও গান’ নামে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর এক বছর পরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ‘বালক’ নামে একটি শিশু-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকার জন্মকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাতে কবিতা লিখতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনা ‘রাজর্ষি’-ও ওই পত্রিকাতেই ধারাবাহিক রচনা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে ওই

'রাজর্ষি'র গল্পাংশ নিয়েই রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক 'বিসর্জন'।

এই সময় 'ভারতী' নামে একখানি পত্রিকা খুবই জনপ্রিয় ছিল। সেই পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত কবিতা লিখতেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনটা সে সময় বেশ আনন্দেই কাটছিল; কিন্তু হঠাৎ এমন একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটে যায় যার ফলে তাঁর সমস্ত আনন্দ নিদারুণ শোকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই শোকাবহ ঘটনাটি হলো রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌদির অকালমৃত্যু।

বৌদির অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তবে, আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সেইহেতু রবীন্দ্রনাথের মনের আকাশ থেকে শোকের কালোমেঘ ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে সেখানে উদয় হলো পূর্ণ শশধর। আবার তিনি শুরু করলেন কবিতা রচনা। এর কিছুদিন পরেই (অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হলো। তাঁর বয়স তখন পঁচিশ বছর।

'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পশ্চিম ভারতের গাজিপুর শহরে বাস করেন। সেখানে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেন সেগুলি পরবর্তীকালে একত্রে গ্রথিত হয়ে 'মানসী' নামে প্রকাশিত হয়।

গাজিপুর হতে কলকাতায় ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক হলো 'রাজা ও রানী'। এটি তিনি রচনা করেন আঠাশ বছর বয়সে, মনে হয় তাঁর দাদা (সত্যেন্দ্রনাথের) বাংলোয় বসে। পরবর্তীকালে এই নাটকের কাহিনী নিয়েই রচিত হয় "তপতী" নাটক।

## ॥ শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে ॥

অনেকেই বলে থাকেন যে, সরস্বতীর সাধনা যারা করে তাদেব প্রতি লক্ষ্মীদেবী নাকি বিরূপ হয়ে থাকেন; আবার লক্ষ্মীর সাধনা যারা করে তারা সরস্বতীর আশীর্বাদ পায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তিনি একই সঙ্গে সরস্বতী এবং লক্ষ্মী উভয়েরই সাধনা করেছেন, এবং সে-সাধনায় সিদ্ধিলাভও করেছেন। তাই আমবা দেখতে পাই, কবি হিসেবে সারা বিশ্বে তিনি যখন স্বীকৃতি লাভ করেছেন সেই সময় তিনি সুষ্ঠুভাবে জমিদারী পরিচালনাও করেছেন।

সোলাপুর হতে রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই মহর্ষি তাঁকে শিলাইদহে পাঠালেন জমিদারী পরিচালনা করতে। রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করলেন না। জীবনকে তিনি নানাভাবে দেখতে চান। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চান জীবনের নানা ক্ষেত্রে। তাই তিনি একদিন শুভক্ষণ দেখে রওনা হলেন শিলাইদহের কুঠিবাড়ি অভিমুখে।

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন যে, বাড়িটা পদ্মা নদীর কাছাকাছি অবস্থিত। শুধু তাই নয়, জমিদারের ব্যবহারের জন্যে একটা সুন্দর বজরাও আছে। বজরাটা দেখে ভারী খুশী হলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই বজরায় বসেই তাঁর দপ্তর চালাতে লাগলেন।

শিলাইদহের সেই কুঠিবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। সে জগৎ হলো পূর্ববঙ্গের পল্লী-জগৎ। এখানে আসবার আগে পল্লীগ্রাম এবং পল্লীবাসীদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর একেবারেই ছিল না। এই প্রথম তিনি কাছে থেকে দেখলেন সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাভরা পল্লীবাংলার দরিদ্র এবং সরল মানুষদের। শুনলেন লালন ফকিরের অপূর্ব পল্লীগাথা।

পল্লী-কবি লালন ফকিরের সহজ সরল অথচ প্রাণময় গানগুলো তাঁকে মুগ্ধ করলো। তিনি তাই লালন ফকিরের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তাঁর বাসস্থানে একটি পাকা দালান তৈরি করে দিয়ে। ফকিরের মাটির ঘর যাতে কালের কবলে নষ্ট হয়ে না যায় সেই উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ বাড়িটিকে পাকা করে দেন। অনেকের ধারণা (এবং সে ধারণা তাঁরা লিখিতভাবেও ব্যক্ত করেন) যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের দেখা হয়েছিল এবং তিনি ফকিরের মুখে তাঁর স্বরচিত গান শুনেছেন। কিন্তু এটা যে সঠিক নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় সৈয়দ মুর্তাজা আলির লেখা 'সাহিত্যতীর্থ শিলাইদহ' শীর্ষক প্রবন্ধে। সৈয়দ সাহেব লিখেছেন:

> "কেউ কেউ লিখেছেন লালন ফকিরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখাশুনা ও আলাপ-আলোচনা হ'ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। তবে, কবি লালন ফকিরের মারফতী গানের ভক্ত ছিলেন; তাঁর কাব্য-রচনায় ও রস-সাধনায় এই পল্লীর দুলাল জনপ্রিয় মরমী কবির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ লালনের অনেক গান সংগ্রহ করে মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন।.......তাঁর জমিদারীসংলগ্ন ছেউড়িয়া গ্রামে লালন ফকিরের কবর আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজব্যয়ে লালন ফকিরের আস্তানায় একটি পাকা দালান তৈরি করে দেন। এই আস্তানা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।"

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতি-থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, লালন ফকিরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যাবার আগেই ফকির দেহরক্ষা করেছিলেন।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায় সৈয়দ সাহেবের প্রবন্ধে। সৈয়দ সাহেব লিখেছেন:

> "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কীর্তির একটি শ্রেষ্ঠ অংশ

'শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে, পদ্মা ও গড়াই নদীর বক্ষে রচিত হয়েছে। কবির প্রথম যৌবনের ছোটগল্পের জন্মস্থান শিলাইদহ। কবি যখন শিলাইদহে আসেন তখন পাঁচ পুত্র-কন্যাই জীবিত। তাঁর দাম্পত্য-জীবনের এক মধুময় অংশ কাটে শিলাইদহে।··· ( তাছাড়া ) এখানেই তিনি বাউল ও সাধকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ-ভাবে মেলামেশার সুযোগ পান ও বাংলার পল্লী-হৃদয়ের ও মরমী কবিদের অন্তরের কথা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। ···সোনার তরী ( ১২৯৮ বাংলা ); মানসসুন্দরী ( ১২৯৯ বাংলা ), উর্বশী ( ১৩০২ বাংলা ). চিত্রা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের অনেক কবিতা ও গান শিলাইদহে রচিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্পের বিষয়বস্তু শিলাইদহ অঞ্চলের সংঘটিত ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে। তাঁর ছোটগল্প 'জীবিত ও মৃত'-র ভিত্তি শিলাইদহের একটি সত্য ঘটনা। 'বোষ্টমী' গল্পের আখ্যানবস্তু সর্বক্ষেপী নামক এক স্থানীয় বৈষ্ণবীর জীবন থেকে ধার করা।"

সৈয়দ সাহেবের প্রবন্ধ থেকে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সম্বন্ধে আরও যে সব অমূল্য তথ্য পাওয়া যায় তা হলো, ওই কুঠিবাড়িতে দীনবন্ধু এনড্রুজ ( C. F. Andrews ) কিছুকাল কবির সঙ্গে বাস করে গেছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন কুষ্টিয়ার হাকিম তখন তিনি প্রায়ই কুঠিবাড়িতে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। এছাড়া, আচার্য জগদীশচন্দ্র, সাহিত্যিক বীরবল ( প্রমথ চৌধুরী ), নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, কবি-বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত ( I. C. S. ) এবং কবি-ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ওখানে এসে কবির সঙ্গে বাস করে গেছেন।

ঠাকুর পরিবারের জমিদারী যখন ভাগ হয় তখন ওই কুঠিবাড়িটি পড়ে কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র) ভাগে।

এর পর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের জমিদার শ্যামারঙ্গিনী রায়চৌধুরী সুরেন্দ্রনাথের জমিদারী বন্ধকীসুত্রে হাইকোর্টের নিলামে খরিদ করে নেন। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'পূর্ববঙ্গ জমিদারী-দখল আইন'এর বলে ঠাকুর পরিবারের জমিদারীটি পাকিস্তান সরকারের দখলে আসে। কিন্তু শিলাইদহের কুঠিবাড়িটি ভাগ্যকুলের জমিদারদের পারিবারিক বাসস্থানরূপে তাঁদের হাতেই থেকে যায়।

এর পর ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পাক সরকার 'পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন' ( Ancient Monument Preservation Act ) অনুসারে উক্ত কুঠিবাড়িটি দখল করে নিয়ে গৌরবময় স্মৃতিপীঠ হিসেবে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করেন।

রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সরকারী শিক্ষানীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি যখন শিলাইদহে ছিলেন, তখন তাঁর ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখানোর ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সব সময় ছেলেমেয়েদের পড়ানো সম্ভব হতো না বলে তিনি তাঁর সাহায্যকারী শিক্ষক হিসেবে লরেন্স সাহেব ও পণ্ডিত শিবেন বিদ্যার্ণব মহাশয়কে নিযুক্ত করেছিলেন। লরেন্স সাহেব পড়াতেন ইংরেজী এবং পণ্ডিতমশাই পড়াতেন সংস্কৃত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতেই তাঁর মনে একটি আদর্শ শিক্ষা নিকেতন স্থাপনের বাসনা জাগে। এবং সেই বাসনারই প্রতিফলন হিসেবে স্থাপিত হয় 'শান্তিনিকেতন'।

আগেই বলেছি যে, শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে যাবার পরেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাংলার সঙ্গে পরিচিত হন। পল্লীবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এই সময়েই। তাদের অশিক্ষা দুঃখ-কষ্ট কবির মনকে কিভাবে নাড়া দিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিজের লেখা থেকেই। তিনি লিখেছেন ঃ

"যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা-লতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানোর গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে জল-কাদায় মাখামাখি ঝাপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপরে একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থ মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মত ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়—তখন সে-দৃশ্য কোনমতেই ভাল লাগে না। ঘরে ঘরে বাত ধরেছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না—এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থান কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়! সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে-সকল উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।" [ ছিন্নপত্র ]

এই সব গরাব মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে কবির মন কিভাবে কেঁদে উঠেছিল, তার পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁর লেখা থেকেই। তিনি লিখেছেন ঃ

"...... পল্লীর দুঃখ-দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছট্‌ফট্‌ করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারী ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় বলে মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম—কী করলে এদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে,

আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে, এই প্রশ্নই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড় অশ্রদ্ধা করে।"

[ পল্লী-প্রকৃতি ]

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বসেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে, "মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন ধর্মগত ও বর্ণগত বৈষম্য নেই, সেটা শুধু মানুষেরই জাগতিক স্বার্থে রচিত। মানবাত্মার মধ্য দিয়েই পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব করা যায়। মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় দেবতা নেই,—আছেন মানুষের মধ্যে, জীবনের সাধনার মধ্যে।"

## ॥ নোবেল প্রাইজ লাভ এবং তারপর ॥

১৩১৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কলকাতার টাউন হলে সর্বপ্রথম 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। টাউন হলে ওই দিন এক বিরাট সভা হয়। সেই সভায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' দেশবাসীর পক্ষ হতে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

এর কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যান। ওখানে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করেন।

আমেরিকায় মাস ছয়েক থেকে আবার তিনি ইংল্যাণ্ডে গেলেন। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড হতে 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়িয়ে পড়লো। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের কবি ও সাহিত্য-সমালোচকরা কবি রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর লেখা 'গীতাঞ্জলি'কে সাদর অভিনন্দন জানালেন।

এই সময় লণ্ডনে অনেকগুলি সভায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। সেই সব সম্বর্ধনা সভায় অনেক বক্তা এ-কথাও বলেন যে, এমন মহৎ ভাবের কবিতা ইংরেজী ভাষায় এর আগে আর কখনো রচিত হয়নি।

গীতাঞ্জলির প্রশংসা ইংল্যাণ্ড হতে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়লো। এর পর বইটি যখন সুইডেনের নোবেল কমিটির কাছে পেশ করা হলো তখন 'সুইডিস অ্যাকাডেমি'র সভ্যরা বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর মহত্তম কবি হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁকে 'নোবেল প্রাইজ' দিয়ে সম্মানিত করলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই সম্মানলাভে উৎফুল্ল হয়ে কবি অতুলপ্রসাদ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আ মরি বাংলা ভাষা'-য় লিখলেন ঃ

"বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনলে মালা জগৎ জিনে।"

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন ঃ

"রবির অর্ঘ্য পাঠায়েছে আজ
ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায়
সপ্তসাগর মিলল আসি।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—
কোথায় শুভ্র তুষারপুরী—
কি মন্তরে মিলল তবু,
অন্তরে কে টানল ডুরি!
কোলাকুলি কালায় গোরায়
প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে
রাজার পূজা আপন রাজ্যে
কবির পূজা দেশে দেশে।"

এদিকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে নোবেল পুরস্কার

পেয়েছেন দেখে ভারতের তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বোধ হয় মনে হলো যে, কবিকে সরকারের পক্ষ থেকেও একটা খেতাব-টেতাব দেওয়া দরকার, নইলে বিশ্ববাসীর কাছে সরকার হাস্যাস্পদ হবে। এই কথা ভেবেই ভারত সরকার রবীন্দ্রনাথকে 'স্যার' উপাধি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, গুণীজনের স্বীকৃতি সরকার দিয়ে থাকেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সরকারী খেতাবের মূল্য যে কানাকড়ির চেয়ে বেশি নয় তার প্রমাণ পেতেও দেরি হলো না ইংরেজ সরকারের।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার তখন ভারতের বুকে চালাচ্ছে ত্রাসের রাজত্ব। ওদের সেই অ-শাসন আর কু-শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এই সময় অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হয়। কথা ছিল যে, পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় সেই সভায় বক্তৃতা করবেন। এ বক্তৃতা যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে হবে তা বুঝতে দেরি হয় না পাঞ্জাব সরকারের। তাই পাঞ্জাবের গভর্নর ডায়ারের নির্দেশে রাইফেল আর মেসিনগানধারী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ওখানে হাজির হয় জেনারেল ও'ডায়ার।

জালিয়ানওয়ালাবাগে তখন হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়েছে লালাজীর বক্তৃতা শোনবার জন্যে। ঠিক এই সময়েই জেনারেল ও'ডায়ার তার সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এ আক্রমণ এমনই বীভৎস যে, ঘটনাস্থলেই তিনশ' উনআশিজন নরনারী নিহত হয় এবং অগণিত নরনারী গুরুতররূপে আহত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সে সময় শান্তিনিকেতনে* ছিলেন। পরদিন তিনি যখন সংবাদপত্রে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পড়লেন, তখন

* তখন শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ তাকে আদর্শ শিক্ষায়তন হিসেবে গড়ে তুলবার জন্যে নিজেই তার ভার নিয়েছেন।

শোকে দুঃখে আর মর্মবেদনায় তাঁর মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তিনি তখন চিন্তা করতে লাগলেন, কিভাবে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানানো যায়। পন্থা স্থির হতে দেরি হলো না। শান্তিনিকেতন হতে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি ভাইসরয়কে একখানি চিঠি লিখে তাঁর দেওয়া 'স্যার' উপাধিটি বর্জন করলেন।

এই প্রসঙ্গে কবি তাঁর শুভানুধ্যায়ীকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন ঃ

> "কলকাতায় এসে বড়লাটকে চিঠি লিখেছি—আমার ঐ 'ছার' ( Sir ) পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। ...আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তার ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই ঐ ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছিনে।"

সে আমলে ইংরেজ সরকার-প্রদত্ত খেতাবধারীরা নিজেদের কেউকেটা বলে মনে করতেন। ইংরেজ সরকার তাঁদের বশংবদ বড়-লোকদের ভেতর থেকে অধিকতর বশংবদ ব্যক্তিদের বাছাই করে প্রতি বছর পয়লা জানুয়ারী তারিখে রায় সাহেব, খান সাহেব, রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি দিয়ে তাঁদের আরও বশীভূত করতেন। আবার সমাজে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কাঞ্চন-কৌলিন্যে মুখ্য কুলীন, তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে 'স্যার' উপাধি দিয়ে জনসাধারণ থেকে তাঁদের আলাদা করে রাখা হতো। এবং এঁরাও ওই সব উপাধি-গর্বে গর্বিত হয়ে ধরাকে সরা এবং ইংরেজকে প্রভু মনে করে ইংরেজের স্বার্থ রক্ষা করে চলতেন। রবীন্দ্রনাথকেও হয়তো ওঁরা তেমনি একজন স্তাবক করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন ; কিন্তু সে আশা-তরুর মূলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্ররূপী কুঠারাঘাত করে জানিয়ে দিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে ওরা যা ভেবেছিল তিনি তা নন।

## ॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দেশে দেশে ॥

কয়েক বছর পরের কথা। কবির কাছে নিমন্ত্রণ পত্র এলো অক্সফোর্ড হতে। অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেক্‌চার দিতে হবে তাঁকে। বছর দুয়েক আগেও একবার সেখান থেকে নিমন্ত্রণ এসেছিল। কিন্তু সে-বার অসুস্থতার জন্যে তিনি সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। এবার তিনি দলবলসহ যাত্রা করলেন।

ইংল্যাণ্ডে না গিয়ে প্রথমেই তিনি গেলেন ফ্রান্সে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে তিনি তাঁর নিজের হাতে আঁকা ছবিগুলির একটি প্রদর্শনী করেন। সে-সব ছবি দেখে চিত্র-রসিক সমাজ এবং শিল্প-সমালোচকরা যথেষ্ট প্রশংসা করলেন কবির শিল্প-প্রতিভার।

প্যারী হতে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে এলেন। ওখানে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই 'মানবধর্ম' সম্বন্ধে অক্সফোর্ডে এক বক্তৃতা দিলেন। তারপর ঐ একই বিষয়ে আরও দু'বার বক্তৃতা দিলেন তিনি।

অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দেবার পরে রবীন্দ্রনাথ জার্মানীতে গেলেন। জার্মানীব বার্লিন শহরে মনস্বী বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বার্লিনে কিছুদিন থেকে তিনি গেলেন জেনেভায়। তারপর রাশিয়ায়।* রাশিয়া দেখে তাঁর মনে একটা নতুন চেতনার সৃষ্টি হলো। এই নবচেতনার কথা তিনি লিখে জানালেন প্রতিমা দেবীকে। কবি লিখলেন ঃ

> "...বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়—আমরা

---

*রাশিয়া সম্বন্ধে কবি আরও অনেক বিষয় লিখে গেছেন। তাঁব সে-সব রচনা একত্রিত হয়ে 'রাশিয়ার চিঠি' নামে প্রকাশিত হযেছে। পাঠক-পাঠিকা এ বিষয়ে ভালভাবে জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথেব 'রাশিয়ার চিঠি' নামক বইখানা পড়ে নিতে পারেন।

যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোষাক দাবি করতে পারব, কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মত। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারীর রথ সে রাস্তায় গেল না। ...আর একবার আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ করবার আশা করব।"

রাশিয়ায় কিছুদিন বাস করে কবি আমেরিকায় গেলেন। সেখানে প্রায় তিন মাস যাবৎ নানা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে আবার তিনি ফিরে এলেন লণ্ডনে। কিছুদিন সেখানে থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার তিনি দেশে ফিরে এলেন।

রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপ ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই হিজলী বন্দীশালায় এমন একটি কাণ্ড ঘটে, যার ফলে সারা দেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। কয়েকজন বাঙালী যুবককে তখন রাজবন্দী হিসেবে হিজলী জেলে আটক রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে জেলখানার ওয়ার্ডারদের বিরোধ বাধে। ওয়ার্ডাররা তখন ওই যুবকদের শায়েস্তা করবার জন্যে মতলব আঁটতে থাকে। এর কয়েক দিন পরেই হঠাৎ বিনা প্ররোচনায় ওয়ার্ডাররা বিপদ সংকেতসূচক হুইসেল বাজিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে 'পাগলা ঘণ্টা।'

জেলখানার নিয়ম অনুসারে কোন ওয়ার্ডার বা অফিসার রাইফেল নিয়ে জেলের ভেতরে যেতে পারে না; তবে পাগলা ঘণ্টার ( Alarm Bell ) সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। তখন হাবিলদারের নেতৃত্বে রাইফেলধারী ওয়ার্ডাররা জেলখানাব ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এবং দরকার বোধ করলে গুলিও চালাতে পারে।

তাই 'পাগলা ঘণ্টা' বেজে উঠতেই জেলারের গোপন নির্দেশে হাবিলদার একদল সশস্ত্র ওয়ার্ডারকে জেলখানার ভেতরে নিয়ে গিয়ে দু'জন রাজবন্দীকে গুলি করে হত্যা করে এবং নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করে অনেক রাজবন্দীকে গুরুতরভাবে আহত করে।

নিরস্ত্র এবং অসহায় রাজবন্দীদের ওপর এই রকম কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে কলকাতার মনুমেণ্ট ময়দানে একটি বিরাট জনসভা হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির ভাষণে তিনি সেদিন ইংরেজ সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন ঃ

> "আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজা যতই পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি ? একথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।"

এই সভা অনুষ্ঠিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ আবার শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন। কারণ সেখানে তাঁর তখন অনেক কাজ।

কয়েক বছর পরে কবির কাছে পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এলো। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সত্তর পার হয়ে গেছে। তিনি তাই যাবেন কি যাবেন না এই কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে কবির পার্শী বন্ধু দিনসা ইরানী তখন জানতে পেরেছেন যে, পারস্যরাজ কবিকে পারস্যে যাবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। দিনসা ইরানী তখন কবিকে একখানি পত্র লিখে তাঁকে পারস্যে যাবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন। ওই পত্রে তিনি আরও লিখলেন যে, পারস্যের বুশেয়ার বন্দর হতে তিনিও কবির সাথী হবেন। কবি তখন পারস্যরাজকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি পারস্যে যেতে রাজী আছেন। শুরু হলো পারস্যযাত্রার প্রস্তুতি। পারস্য সরকারের পক্ষ হতে কবিকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তাঁকে

বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ১১ই এপ্রিল (১৯৩২) তারিখে দমদম বিমানবন্দর হতে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট বিমানটি পারস্য অভিমুখে যাত্রা করবে

নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে দমদম বিমানবন্দর হতে বিমানটি পারস্য অভিমুখে যাত্রা করে এবং পরদিন, অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল কবিকে বুশেয়ার বন্দরে নামিয়ে দেয়। কবি-বন্ধু দিনসা ইরানী ওখানে আগে থেকেই কবির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কবি বিমামবন্দরে অবতরণ করলে তিনি এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

বুশেয়ার হতে কবিকে মোটরে করে ফিরোজ শহরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এক বিরাট জনসভায় কবিকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ফিরোজে কয়েকদিন থেকে কবি গেলেন ইস্পাহানে। সেখান থেকে তেহেরাণে। তেহেরাণেই পারস্যরাজ রেজা শাহ পহ্লবীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কবির একাত্তর বৎসরের জন্মদিনের উৎসবও তেহেরাণে অনুষ্ঠিত হয়।

পারস্য ভ্রমণ শেষ হবার আগেই ইরাকের শাহ'র কাছ থেকে ইরাক ভ্রমণের জন্যে নিমন্ত্রণ পত্র এলো রবীন্দ্রনাথের কাছে। এই নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে কবি ৫ই মে তারিখে তেহেরাণ হতে মোটরে বোগদাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তেহেরাণের মত বোগদাদেও তাঁকে মহা-সমাদরে আপ্যায়ন করা হয়। বোগদাদে কবিকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় তার উত্তরে তিনি ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করবার ব্যাপারে বোগদাদের মুসলমান সমাজের সহযোগিতা কামনা করেন।

বোগদাদে কয়েকদিন কাটিয়ে ৩রা জুন তারিখে (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ আবার কলকাতায় ফিরে এলেন।

## ॥ ভারত-ভ্রমণ ॥

বিদেশ ভ্রমণ শেষ হবার পবে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতায় থেকে ভাবত-ভ্রমণ শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রথমেই গেলেন বোম্বাই শহরে। সেখানে তখন 'রবীন্দ্র-সপ্তাহ'-ব অনুষ্ঠান চলছিল। তখন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেব এপ্রিল মাস। কবিব সঙ্গে শান্তিনিকেতনেব কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীও গিয়েছিলেন। তাঁবা সেখানে 'তাসের ঘর' আর 'শাপমোচন' অভিনয় করলেন।

বোম্বাই হতে কবি গেলেন ওয়ালটেয়ারে। সেখানে গিয়ে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন। এব পর তিনি গেলেন হায়দরাবাদে। হায়দবাবাদ তখন নিজাম-শাসিত দেশীয় বাজ্য (Native State)। এ রাজ্যের অধিবাসীদের শতকরা নব্বই ভাগ হিন্দু আর শতকরা দশ ভাগ মুসলমান।

হায়দরাবাদেও কবিকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করা হয়।

নিজামের অতিথিরূপে হায়দরাবাদে দেড় মাস থেকে আবার তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতা শহরে তখন রামমোহন শতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান চলছিল। সেই অনুষ্ঠানে কবি একদিন তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। এর কয়েকদিন পরেই তিনি 'শান্তিনিকেতন'-এ ফিরে গেলেন।

কবির বয়স তখন তিয়াত্তর পার হয়ে চুয়াত্তরে পড়েছে। কিন্তু এই বয়সেও 'শান্তিনিকেতন'-এর জন্যে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, 'শান্তিনিকেতন'কে তিনি যথার্থ শান্তি-নিকেতন করে গড়বেনই। কিন্তু গড়বার উদ্দেশ্য থাকলেও হাতে তাঁর টাকা ছিল না। তাই তিনি একদল ছাত্র-ছাত্রী

নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অর্থসংগ্রহের আশায়। ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অভিনয় করিয়ে অর্থসংগ্রহ করবেন, এই উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধ বয়সে কবি আবার বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথমেই তিনি গেলেন সিংহলে। সেখান থেকে ফিরবার সময় মাদ্রাজে নামবার ইচ্ছা ছিল তাঁর; কিন্তু নানা কারণে সেবার আর মাদ্রাজে নামা হলো না।

এর পর পুজোর ছুটিতে তিনি মাদ্রাজ রওনা হলেন। মাদ্রাজে 'শাপমোচন' অভিনয় হলো। ওখানকার কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করলেন তিনি; কিন্তু অন্যান্য জায়গায় কবির আগমনে যে রকম উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল মাদ্রাজে তেমন কিছু হলো না। তিনি তাই কিছুটা ক্ষুণ্নমনেই 'শান্তিনিকেতন'-এ ফিরে এলেন।

এর পর (১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে) কাশী বিশ্ববিদ্যালয় (বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি)-এর পক্ষ থেকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানালেন সেখানকার সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করবার জন্যে। মালব্যজীর নিমন্ত্রণ খুশীমনেই গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। যথাসময়েই তিনি উপস্থিত হলেন সেখানে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় সে-বার রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন।

কাশী হতে রবীন্দ্রনাথ গেলেন লক্ষ্ণৌ। সেখানে দিন পনের কাটিয়ে আবার তিনি শান্তিনিকতনে ফিরে এলেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্যে তখন 'শ্যামলী' নামে একটি মাটির ঘর তৈরী হয়েছে। কবির ইচ্ছানুসারেই এটা হয়েছে। কবি খুশীমনে সেই মাটির ঘরে বাস করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে এসে গেল এপ্রিল মাস। কবির বয়স চুয়াত্তর পেরিয়ে পঁচাত্তরে পড়লো। কয়েকদিন পরেই শুরু হলো কবির জন্মবার্ষিকী উৎসব। সে-বারের উৎসবে পরশুরাম রচিত 'বিরিঞ্চি-বাবা' গল্পটিকে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

ওই দিনেই কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ 'শেষ সপ্তক' প্রকাশিত হলো।

তখন গ্রীষ্মের ছুটি থাকায় রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে কিছুদিন গঙ্গার বুকে বোটে বাস করেন। বোটে বসেও তিনি আলস্যে সময় কাটাননি। গঙ্গাবক্ষের স্নিগ্ধ হাওয়ায় বোটের পাটাতনে বসে তিনি একের পর এক কবিতা লিখতে লাগলেন।

ছুটি শেষ হলে আবার তিনি ফিরে গেলেন 'শান্তিনিকেতন'-এ।

এদিকে শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা তখন রীতিমত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অবস্থা এমন যে, দৈনন্দিন খরচ চালানোই দায় হয়ে উঠেছে। কবি তখন আবার বের হলেন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। এবারে তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই গেলেন পাটনায়। সেখানে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় বেশ ভালই জমলো। কিছু টাকাও পেলেন কবি। কিন্তু যতটা আশা করেছিলেন, ততটা পেলেন না।

পাটনা থেকে তিনি গেলেন এলাহাবাদে। সেখানেও 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীত হলো। কিছু টাকাও পেলেন।

এর পর তিনি গেলেন লাহোরে। সেখানেও 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীত হয় এবং কিছু টাকা তাঁর হাতে আসে। কিন্তু বিশ্বভারতীর দেনা তখন ষাট হাজার টাকা; তার সামান্যতম ভগ্নাংশও তাঁর হাতে আসেনি তখন।

ব্যাপার দেখে কিছুটা হতাশ হয়ে অবশেষে তিনি দিল্লীতে গেলেন। দিল্লী রাজধানী শহর। রবীন্দ্রনাথের আশা যে, ওখানে হয়তো কিছু বেশী টাকা তিনি পাবেন।

গান্ধিজী তখন দিল্লীতে ছিলেন। তিনি কবির সঙ্গে দেখা করলে কবি তাঁর কাছে অকপটে তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা জানালেন। তিনি বললেন যে, ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর জন্যে ষাট হাজার টাকা ঋণ করতে হয়েছে তাঁকে।

কবির কাছ থেকে এই কথা শুনে গান্ধিজী নিজে উদ্যোগী হয়ে ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করে কবিকে দিলেন। কবি তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে 'শান্তিনিকেতন'-এ ফিরে এলেন।

॥ শেষজীবন ॥

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস। কবির বয়স তখন আটাত্তরে পড়েছে। সেবারের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হলো কালিম্পং শহরে। কারণ, গরমের জন্যে কবি তখন কালিম্পং-এ ছিলেন।

কালিম্পং হতে কবি গেলেন মংপুতে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আবার গেলেন কালিম্পঙে।

রবি তখন অস্তাচলগামী। দেহটা ক্রমশঃ অচল হয়ে আসছে। কবি বেশ বুঝতে পারছেন যে, তাঁর শেষের দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু তবুও লেখার বিরাম নেই। কালিম্পঙে বসে তিনি তখন লিখছেন 'বাংলা ভাষা পরিচয়', এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে চলছে কবিতা লেখা।

কিছুদিন মংপু আর কালিম্পঙে থেকে আবার তিনি ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। সেবার আর পূজার ছুটিতে কোথাও গেলেন না। ঘরে বসে লিখতে লাগলেন প্রবন্ধ আর কবিতা।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জওহরলাল এলেন 'হিন্দী ভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করতে। দৈবচক্রে সুভাষচন্দ্রও সেই সময় শান্তি-নিকেতনে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন কংগ্রেসের সভাপতি। কলকাতা শহরে তিনি একটি ভবন তৈরি করবার জন্যে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এ একখণ্ড জমি একশ' বছরের জন্যে লীজ নিয়েছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে। কর্পোরেশন বার্ষিক এক টাকা

খাজনায় ওই জমিটা লীজ দেন সুভাষচন্দ্রকে। ওই জমিতে তাঁর প্রস্তাবিত ভবনের ভিত্তি স্থাপনের জন্যে সুভাষচন্দ্র অনুরোধ করলেন কবিকে। সঙ্গে সঙ্গে কবি রাজী হলেন সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে। এর পর নির্দিষ্ট তারিখে তিনি কলকাতায় এসে উক্ত ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। বাড়িটির নামকরণও তিনিই করলেন—"মহাজাতি সদন"।

ভারতের এই দু'জন মহান জননেতাকে পেয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা তখন আনন্দে উদ্বেল। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও নাটকের মহলা ঠিকই চলেছে। স্থির হয়েছে যে সামনের মাসে কলকাতায় 'তাসের দেশ', 'শ্যামা' আর 'চণ্ডালিকা'-র অভিনয় হবে।

বিহারের জননেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও (পরে যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হন) ওই বছরই শান্তিনিকেতনে যান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

জননেতাদের সাহচর্যে এবং নাট্যাভিনয়ের আনন্দে সেপ্টেম্বর মাস এসে গেল।

হঠাৎ খবর এলো যে, জার্মানীর ফুয়েরার হের হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পোল্যাণ্ডের পতন হলো। এর পর হিটলারের নাৎসী-বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালিয়ে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং সুইডেন দখল করে নিল। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

এদিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা তখন রীতিমত ঘোরালো। ভারতের ইংরেজ সরকার তখন ভারতবর্ষকে যুদ্ধের ভেতরে টেনে এনেছেন। ইয়োরোপের যুদ্ধের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক না থাকলেও এ-দেশ ইংরেজের অধীন বলে ওরা গায়ের জোরেই ভারত-বাসীকে যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে।

কবি তখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তবুও তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। সবাইকে শুনিয়ে বললেন—এ অন্যায়, রীতিমত

অন্যায়। না, ইংরেজের এ ঔদ্ধত্য সহ্য করা যায় না।' আমি এর বিরুদ্ধে লিখবো।

সত্যিই তিনি শুরু করলেন রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখা।

এই সময়ই কবির কাছে আমন্ত্রণ এলো মেদিনীপুর থেকে। 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির' উদ্বোধন করতে হবে তাঁকে। কবি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে মেদিনীপুরে গিয়ে উদ্বোধন করলেন করুণাসাগর বিদ্যাসাগর-এর স্মৃতিমন্দির। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বললেন ঃ

"বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসে আবার তিনি লেগে গেলেন কাজে। কাজ আর কাজ ; লেখা আর লেখা। এর কোন বিরাম নেই। এমনি করেই কেটে গেল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গান্ধিজী আর কস্তুরবাঈ শান্তিনিকেতনে এসে দুই দিন থেকে গেলেন। কবির শরীর তখন ভেঙে পড়েছে। তিনি বুঝতে পারছেন, বিদায়ের দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু বিশ্বভারতীর জন্যে তাঁর চিন্তার শেষ নেই। তিনি তাই গান্ধিজীর হাতে বিশ্বভারতীর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

কবির শরীর তখন আরও ভেঙে পড়েছে। এই সময় একদিন খবর এলো যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'ডক্টর' উপাধি দিয়েছেন। তখন ছিল আগস্ট মাস। ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার 'শান্তিনিকেতন'-এ এসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হতে লাটিন ভাষায় একটি মানপত্র পাঠ করে শুনালেন। কবি তাঁর প্রতিভাষণ দিলেন সংস্কৃতে।

এর কয়েকদিন পরে কবির শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়লো। ডাক্তাররা বললেন—আপনার এখন কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

কবি তাঁদের কথা না শুনে কালিম্পং রওনা হলেন।

সেখানে গিয়ে দিন সাতেক পরেই হঠাৎ তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবশেষে ২৯শে অক্টোবর তারিখে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় আনা হলো।

কলকাতায় এসে মাস দেড়েক শয্যাশায়ী থাকবার পর সে-যাত্রা তিনি সেরে উঠলেন।

এই প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবী লিখেছেন ঃ "দ্বিতীয় মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পান এবং মুখে মুখে ছড়া তৈরি করেন, কবিতা লিখতে থাকেন ; সেই সময় আশে পাশে যাঁরা থাকেন তাঁরা টুকে নিতেন সেই সব রচনা।"

জ্ঞান ফিরবার পব কবি প্রথম যে কবিতাটি মুখে মুখে রচনা করেন তার শেষ চারটি লাইন হলো ঃ

"প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারেব শিরে শিরে।"

এই কবিতাটি তিনি রচনা করেন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর।

নভেম্বর মাসে কবি আবার 'শান্তিনিকেতন'-এ গেলেন। তখন লিখতে তাঁর রীতিমত কষ্ট হতো। তিনি তাই মুখে মুখে কবিতা রচনা করে যেতেন আর তাঁর ভক্তরা সেগুলো লিখে ফেলতেন। এই অবস্থায় তিনি যে সব কবিতা রচনা করেছিলেন সেগুলো হতে তেত্রিশটি কবিতা নিয়ে 'আরোগ্য' নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

* * *

১৯৪০ শেষ হয়ে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ শুরু হলো। আবার এসে পড়ল কবির জন্মদিন। ১৩৪৮ সালের ২৫শে বৈশাখ ( ইংরেজী ৮ই মে,

১৯৪১)। এই দিনটিই কবির জীবনের শেষ ২৫শে বৈশাখ। সেদিন কবি লিখলেন ঃ

"আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চবম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।"

সত্যিই তিনি সেদিন মানুষের শেষ আশীর্বাদ নিয়ে গেলেন। কারণ এর পর আর তাঁকে আশীর্বাদ জানাবার সুযোগ আসেনি

কবি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। শরীর আর চলছে না। এই সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা মিস রাথবেন ভারতবর্ষের প্রতি কটূক্তি করে একখানা খোলা চিঠি লেখেন।

রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যা হতেই তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করলেন।

আষাঢ় মাস এসে পড়লো। কবি তখন বর্ষার রূপ দেখার জন্যে উতলা হয়ে উঠলেন। ভক্তদের বললেন—"আমাকে তোমরা বর্ষার রূপ দেখতে দাও।"

ভক্তরা সঙ্গে সঙ্গে কবিকে উত্তরায়ণের দোতলায় এনে বসিয়ে দিলেন। সেখানে বসে কবি প্রাণভরে দেখতে লাগলেন বর্ষার রূপ।

কবির অসুখ বেড়েই চলেছে। ব্যাপার দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কবির ইচ্ছাক্রমে কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হলো। কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় তাঁকে নিয়ে আসা হলো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তাররা বললেন, অপারেশন করতে হবে; এখন অপারেশন ছাড়া আর কোন চিকিৎসা নেই।

কবিকে জানানো হলে তিনি সম্মতি দিলেন। স্থির হলো, ৩০শে জুলাই অপারেশন হবে।

অপারেশনের দিন কবি তাঁর সর্বশেষ কবিতাটি মুখে মুখে রচনা করেন। এটি তিনি রচনা করেন অপারেশনের কিছুক্ষণ আগে। পাঠকদের অবগতির জন্যে সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী !
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হা .ে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমারে জ্যোতিষ্ক তারে যে পথ দেখায়
সে যে তার অ ন্তবের পথ।
সে যে চি র স্বচ্ছ
সহজ বিশ্বাসে সে যে করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাদের গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যেবে সে পায় আসল আলোকে ধৌত অন্তরে
অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

এই কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা। এর পর আর কোনদিন কবি-কণ্ঠে বেজে ওঠেনি কোন সুর। স্তব্ধ হয়ে গেছে কবির লেখনী।

কিছুক্ষণ পরেই কবির দেহে অস্ত্রোপচার করা হলো। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। কবি রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারা গেল যে, তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। অবশেষে ২২শে শ্রাবণ বাংলার বুলবুল, বাংলা মায়ের আদরের নিধি বাঙালীর গর্ব কবিকুলচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী হতে চিরবিদায় নিলেন।

# নজরুল

॥ বিদ্রোহী কবি নজরুল ॥

নজরুল ইসলাম।

'অগ্নিবীণা'র রচয়িতা বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। কিন্তু কার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ, সেই কথাটাই আগে বলা দরকার। কারণ ভারতবর্ষে অনেকেই বিদ্রোহ করেছেন। হিন্দু আমলে চন্দ্রগুপ্ত বিদ্রোহ করেছিলেন মগধের রাজশক্তির বিরুদ্ধে; এবং সে বিদ্রোহে জয়যুক্তও হয়েছিলেন তিনি। মুসলমান আমলে শিবাজী বিদ্রোহ করেছিলেন; এবং সেই বিদ্রোহের ফলেই গঠিত হয়েছিল শক্তিশালী মারাঠা সাম্রাজ্য। সাশারামের জায়গীরদার ফরিদশাহ মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অধিকার করে নিয়েছিলেন দিল্লীর সিংহাসন। তারপর সেই বিদ্রোহী ফরিদশাহ হয়েছিলেন বাদশাহ শেরশাহ।

বাদশাহ ঔরংজীবও বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি বিদ্রোহী হয়েছিলেন তাঁর পিতা সম্রাট শাজাহানের বিরুদ্ধে। পিতাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করে রেখে নিজে সম্রাট হয়ে বসেছিলেন। সুলতানা রাজিয়ার সভাসদরাও বিদ্রোহী হয়েছিলেন। নারীর শাসনকে বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না তাঁরা। তাই সুলতানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। সম্রাট আকবরের অভিভাবকও বিদ্রোহী হয়েছিলেন।

ইংরেজ আমলেও অনেকবার বিদ্রোহ হয়। নানা ফড়নাবিশ, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপি, সিপাই মঙ্গল পাঁড়ে এবং আরও হাজার হাজার সিপাই বিদ্রোহ করেছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সেই ঐতিহাসিক

মুক্তিযুদ্ধকে ইংরেজ এবং ইংরেজের স্তাবকরা আখ্যাত করে গেছেন 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে।

ইতিহাস রচনা করে রাজশক্তির স্তাবকরা। রাজশক্তিকে খুশী করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের মনের মত করে ঘটনাকে বিকৃত করে। তাই যুগে যুগে মুক্তি-পাগল মুক্তিযোদ্ধাদের ওরা চিহ্নিত করে বিদ্রোহী বলে।

'বিদ্রোহী' শব্দটার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি আপত্তিকর অর্থ। অর্থাৎ, যে লোক বিদ্রোহ করে সে অন্যায়কারী এবং যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয় সে যদি শক্তিমান ও বিজয়ী হয়, অমনি সে হয়ে যায় ন্যায়বান। আবার কোন বিদ্রোহী যখন রাজ্য অধিকার করে রাজা হয়ে বসে, তখনই ঐতিহাসিকদের কলম ঘুরে যায়। তখন সেই বিদ্রোহী আর বিদ্রোহী থাকে না, সে হয়ে যায় ন্যায়পরায়ণ রাজা।

নজরুলের বিদ্রোহ কিন্তু উপরোক্ত সংজ্ঞায় পড়ে না। তাঁর বিদ্রোহ অন্যায়ের এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে। যেখানেই তিনি অন্যায় দেখেছেন, সেখানেই তাঁর লেখনী অগ্নিবর্ষণ করেছে সেই অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে—সে অন্যায় রাজনৈতিকই হোক অথবা সামাজিকই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। অন্যায়কারী সব সময়েই দুষ্কৃতকারী। এবং সেই অন্যায়কারীর বিরুদ্ধেই ছিল নজরুলের বিদ্রোহ।

তদানীন্তন ইংরেজ সরকার ছিল পয়লা নম্বরের দুষ্কৃতকারী। তাই নজরুলের লেখনী বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। ধর্মের ধ্বজাধারী মোল্লা-মৌলবী-মোহান্ত ইত্যাদি তথাকথিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও নজরুলের লেখনী ছিল ভীমরুলের হুলের মত। সমাজপতি সেজে যারা অন্যায় কাজ করে চল্‌তো তাদের বিরুদ্ধেও ছিল নজরুলের বিদ্রোহ।

ইংরেজ তাদের কারাগারে দেশপ্রেমিক যুবকদের বন্দী করে রেখে-ছিল। ইংরেজের চোখে তারা রাজদ্রোহী। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কে রাজা? কে তাদের রাজা করেছে? জাল-জোচ্চুরি, তস্করবৃত্তি

আর হীন ষড়যন্ত্র করে যারা দেশের রাজসিংহাসন দখল করেছে, নজরুলের চোখে তারাই দুষ্কৃতকারী। তাই নজরুল অগ্নিবর্ষী ভাষায় লিখেছেন ঃ

"কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফ্যাল কর রে লোপাট,
রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণ বেদী—
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান,
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।"

কিন্তু কারাগারের লৌহ-কপাট ভাঙতে বললেই তো ভাঙা যায় না। ভাঙার জন্যে মানুষ চাই। কোথায় সে রকম মানুষ? বুড়ো-হাবড়া রোগা-পটকা মানুষদের দিয়ে ও-কাজ হবে না। ওর জন্যে চাই শক্তিমান তরুণদল। কিন্তু দেশে যে তরুণরা মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘুরি করে, রাস্তায়-ঘাটে ইয়ার্কি মেরে আর সিগারেট ফুঁকে দিন কাটায়, তাদের দিয়ে ও-কাজ হবে না। কিন্তু হবে না বললে চলবে কেন? ওরাই তো দেশের শক্তি! অতএব ওদেরকে জাগিয়ে তুলতেই হবে। তাই নজরুলের লেখনী হতে বের হলো ঘুম ভাঙানোর কবিতা ঃ

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন দেশে দেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!"

কিন্তু শুধু জয়ধ্বনি করলেই চলবে না। নবীনদের এগুতে হবে;

সৈনিকের মত মার্চ করে এগুতে হবে। তাই নজরুল রচনা করলেন বাংলায় মার্চ-সঙ্গীত ঃ

"চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল,
চল্ রে চল্ রে চল্।"

আবার মার্চ করলেই চলবে না। কুচকাওয়াজও শিখতে হবে তরুণদের। কবি তাই লিখলেন 'কুচকাওয়াজ'-এর কবিতা ঃ

"কোথায় মানিক ভাইরা আমার সাজরে সাজ!
আর বিলম্ব সাজে না চালাও কুচকাওয়াজ!
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ!—
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল ফসল।
অগ্রপথিক রে যুবাদল।
জোর কদমে চল রে চল্।"

ধর্মের ধ্বজা ধরে যারা অধর্মাচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন নজরুল। তিনি লিখেছিলেন ঃ

তব মসজিদে মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি।
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।

নজরুল চান, এ চাবি ভেঙে ফেলতে। তিনি তাই রুদ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

"খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা, হাতুড়ি শাবল চালা!"

আর একটি কবিতায় নজরুল লিখেছেন ঃ

"মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি!"

আচারসর্বস্ব সমাজপতিদের কষাঘাত করে কবি লিখেছেন ঃ

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া !
ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া !
বলতে পারিস বিশ্বধাতা ভগবানের কোন্ সে জাত !
কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ ?
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই ?
( তোরা ) ছেলের হাতে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া ।"

বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহের এখানেই শেষ নয়। আজ যেমন দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার দেখা যায়, "যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ"—কবির লেখনীতেও সেই কথা সে আমলে লিখিত হয়েছিল নতুন ছন্দে, জোরালো ভাষায়। কবি লিখেছিলেন ঃ

"আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত ।"

অত্যাচারিত দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলতে, তাদের উদ্বুদ্ধ করতেও কবির লেখনী ছিল সোচ্চার। তাই তিনি লেখেন ঃ

"ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা,
ও যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা !
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই আবার জ্বলবে দেশে বজ্রানল ।"

জাতিসঙ্ঘের ( League of Nations ) বিরুদ্ধেও কবি ছিলেন বিদ্রোহী। তাঁর মতে ওটা ছিল চোর জোচ্চোর আর ডাকাতের আড্ডাখানা। সাধারণ অর্থে যাদের চোর-ডাকাত বলা হয়, তাদের মধ্যে অনেকেই চুরি-ডাকাতি করে পেটের দায়ে, কিন্তু জাতিসঙ্ঘের

বসে অথবা শাসকের গদীতে বসে যারা চুরি-ডাকাতি করে লোকে তাদের সমীহ করে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর আসল চেহারা নজরুল তুলে ধরেছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জোরালো ভাষায়। পেটের দায়ে যারা চুরি-ডাকাতি করে তাদের প্রতি ছিল নজরুলের সহানুভূতি; কিন্তু তাবড় তাবড় চোর-ডাকাতদের তিনি ক্ষমার চোখে দেখেননি। তিনি তাই লিখে গেছেন :

"কে তোমায় বলে ডাকাত, বন্ধু ; কে তোমায় চোর বলে?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি-ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে।
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়।
যারা যত বড় ডাকাত, দস্যু, দাগাবাজ,
তারা তত বড় সন্ন্যাসী গুণী জাতিসঙ্ঘেতে আজ।"

অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধেই কবির লেখনী সবচেয়ে বেশী সোচ্চার ও বেশী তীব্র ছিল। তিনি তাই ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন :

"( তোমরা ) ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
( সেই ) ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়।
( মোরা ) আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
( মোরা ) ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।"

কিন্তু ইতস্ততঃ কবিতা লিখেই বিদ্রোহী কবি ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তাঁর নিজের সম্পাদনায় বের করলেন 'ধূমকেতু' নামক সাময়িক পত্রিকা। ধূমকেতুর জন্মলগ্নে কবিগুরু আশীর্বাদ জানালেন :

"আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু!
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের ওই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় চেতন;
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোল না লেখা

জাগিয়ে দে রে ধমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।"

বিশ্বকবির এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন নজরুল। 'ধূমকেতু'-র প্রথম শারদীয় সংখ্যায় দশভুজা দুর্গাদেবীকে বন্দনার ছলে নজরুল লিখলেন ঃ

"আর কতকাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গকে আজ জয় করেছে
অত্যাচারীর শক্তি-চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক,
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা
আসবি কখন সর্বনাশী ?"

এই কবিতা পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো ইংরেজ সরকার। 'ধূমকেতু'র শারদীয় সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করলো তারা। কবি নজরুলকেও তারা গ্রেপ্তার করে বিচারালয়ে হাজির করলো রাজদ্রোহমূলক কবিতা রচনার অভিযোগে।

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনা হলো কবিকে। দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো আসামীর কাঠগোড়ায়। সরকারী উকিল জোরালো বক্তৃতা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলো যে, নজরুল ইসলাম রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।

এর উত্তরে কবি তাঁর ঐতিহাসিক জবানবন্দীতে বলেন ঃ

"আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমি জানি এবং দেখেছি, আজ এই আসামীর পিছনে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজা-নিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারেন না। এমনি বিচার

প্রহসন করেই সেদিন খ্রীষ্টকে ক্রুসবিদ্ধ করা হলো। গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পিছনে এসে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পাননি। তাঁর আর ভগবানের মধ্যে সম্রাট দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্রাটের ভয়ে বিচারকের বিবেক দৃষ্টি অবাক হয়ে গেছলো।...

আমার বাঁশি কেড়ে নিলেই বাঁশির সুরের মৃত্যু হয় না। কেন না, আমি আর এক বাঁশি নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সেই সুরে ফুঁ দিতে পারি। সুর আমার বাঁশিতে নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশির সৃষ্টির কৌশলে।...দোষ আমারও নয়—দোষ তাঁর, যিনি আমার কর্ণে বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই।"

কবি ঠিকই বলেছিলেন যে, সম্রাটের ভয়ে বিচারকের বিবেক ঝাপসা হয়ে যায়। এ মামলাতেও তাই হলো। কবি নজরুল ইসলামকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট।

এর পরেই শুরু হলো নজরুলের কারা-জীবন। কিন্তু তাঁর সেই কারাজীবনের কথা, অথবা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা বলবার আগে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় অর্থাৎ বংশ-পরিচয়, পিতৃমাতৃ-পরিচয়, জন্ম, বাল্যকাল এবং শিক্ষাকাল সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বোধ করছি। নজরুলের বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন আমি নিজের কথায় না লিখে সাহিত্যিক মইনুদ্দিন এবং ইন্দ্রজিৎ রায়ের রচনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

## ॥ জন্ম ও বাল্যজীবন ॥

তেরশ ছয় সালের এগারই জ্যৈষ্ঠ নজরুল ইসলাম পৃথিবীর মাটি প্রথম স্পর্শ করেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহম্মদ এবং মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে বাস করতেন তাঁরা।

ফকির আহম্মদ সাহেব ছিলেন ধর্মভীরু মানুষ। নমাজ, রোজা আর তসবীহ্‌-তেলাওয়াৎ নিয়েই মসগুল থাকতেন তিনি। তাঁদের বাড়ির কাছেই ছিল 'পীর-পুকুর' নামে একটা দীঘি। সেই দীঘির পাড়ে হাজী পাহ্‌লোয়ান নামে এক পীর সাহেবের মাজার শরীফ আর একটি মসজিদ ছিল। এই মাজার আর মসজিদের খেদমত করেই ফকির আহম্মদ সাহেব দিন কাটাতেন।

ছেলেবেলায় নজরুল ইসলাম ছিলেন খুবই দুষ্টু। তাঁর দুষ্টুমির জ্বালায় সবাই যেন ভয়ে কাঁপতো। কত রকমের দুষ্টুমিই যে তাঁর মাথায় খেলতো, তার ইয়ত্তা নেই। পাখির ছানা পাড়া থেকে আরম্ভ করে মানুষের 'পাকা ধানে মই' দেওয়া পর্যন্ত কোন দুষ্টুমিতেই তিনি পিছপা ছিলেন না। মাঝে মাঝে তাঁর দুষ্টুমি একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো। গ্রামের দুষ্টু ছেলেদের তিনি ছিলেন সর্দার।

তাঁর বাবা তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কিছু কিছু ফার্সী আর কেরান শরীফ পড়েছিলেন। দুষ্টু ছেলেদের একটা মজা এই যে, দুষ্টুমিতেও তারা যেমন ওস্তাদ হয় আবার পড়াশুনাতেও তারা হয় সবচাইতে ভাল। নজরুল ইসলামের বেলায়ও এই কথাটি খাটে। দশ বছর বয়সে তিনি যখন মক্তবের পড়া শেষ করলেন, তখন দেখা গেল, তিনি যেটুকু শিখেছিলেন তার মধ্যে কোন গলদ নেই, কোন ফাঁকি নেই। এই বয়সেই তিনি উর্দু আর ফার্সী এমন সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতেন যে, যা শুনে সবারই তাক

লেগে যেতো। তাঁর খোশ্ এলহানে কুরআন শরীফ তেলাওয়াৎ শুনে বড়ো বড়ো মৌলভী মওলানা সাহেবরাও খুশিতে তাঁর পিঠ চাপড়াতেন। মক্তবের পড়া শেষ করলেন তিনি দশ বৎসর বয়সে। এর পরেই তাঁর পড়াও গেল বন্ধ হয়ে; কারণ, তাঁর বাবা তখন মারা গেছেন। তাঁর দুঃখিনী মা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অকূল সাগরে ভাসলেন।

গরীবের সংসার। খেতেই কুলোয় না, তাঁকে পড়াবে কে? এক বছর পর্যন্ত নজরুল ইসলাম ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা করলেন। এই সময় তিনি গ্রামে মোল্লাকী করতেন আর মসজিদে ইমামতী করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা তাঁর অশান্ত মন কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না। অভিভাবকহীন নজরুলের মনটা লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো যেদিকে ইচ্ছা ছুটে যেতে লাগলো।

তাঁর এক চাচার নাম ছিল কাজী ফজলে করীম। তিনি ফার্সীতে ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর সেই কবি-প্রতিভার ছায়া নজরুলের জীবনেও পড়েছিল। কবি তাই অল্প বয়সেই নানা রকমের ফার্সী বাংলা মেশানো কবিতা লিখতে চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে দু'একটা কবিতা বেশ ভালো হয়েও যেতো।

পাশের গ্রামে 'লেটো' গানের একটা দল ছিল। তারা যাত্রা গানের মতো এক রকম পালা গান করতো। নজরুল মাঝে মাঝে তাদের জন্যে পালা গান লিখে দিতেন। এতে তাঁর দু'পয়সা রোজগারও হতো। এই অল্প বয়সেই তিনি পালা গান লিখে বেশ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর গানের আদরও খুব বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের ঐ ছোট্ট জায়গায় তিনি নিজেকে ধরে রাখতে চাইলেন না; একদিন গ্রাম থেকে পালিয়ে চলে গেলেন আসানসোলে।

পালিয়ে তো গেলেন, কিন্তু খাবেন কি? পেট বড়ো দারুণ জিনিস। একদিন আহার না জুটলেই চোখে আঁধার দেখতে হয়,

তিনি তাই পাঁচ টাকা মাইনেয় ময়দা মাখার কাজ নিলেন একটি রুটির দোকানে।

তিনি দিনের বেলা ময়দা মাখেন আর রাত্রে অবসর সময় সুর করে পুঁথি পড়েন ও গান গেয়ে সকলকে মাতিয়ে তোলেন এবং বাজনা বাজিয়ে পাড়া তোলপাড় করেন। এই সব কারণে অনেকেরই নজর পড়লো তাঁর উপর।

আসানসোলে কাজী রফিউদ্দিন নামে একজন দারোগা ছিলেন। নজরুলের গুণের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। ভাবলেন, একে লেখাপড়া শেখাতে পারলে কালে হয়তো খুব বড় কাজ করতে পারবে। তিনি নজরুলকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলেন। তাঁর বাড়ি ছিল ময়মনসিং জেলার কাজীর-শিমলা গ্রামে। এর কাছেই দারিরামপুর হাইস্কুল। সেখানে তিনি নজরুলকে ভর্তি করে দিলেন। এই স্কুলে নজরুল মাত্র এক বৎসর পড়েন। এই সময় স্কুলের হেডমাস্টার বদলি হয়ে যাওয়ায় নজরুলের মন ওখানে টিকলো না। তিনি রাণীগঞ্জে গিয়ে সিয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হলেন।

হাইস্কুলে ভর্তি তো হলেন; কিন্তু তাঁর অশান্ত মন স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারলো না। তিনি স্কুলের বই ছেড়ে বাইরের বই পড়েন, পরীক্ষার খাতায় কবিতা লিখে নিজের শক্তির পরিচয় দেন; এমনিভাবে হ-য-ব-র-ল আর গোলমালের মধ্যে তিনি ক্লাশ টেন পর্যন্ত উঠলেন।

তখন পৃথিবীতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। দলে দলে লোক পল্টনে ভর্তি হয়ে লড়াইয়ে যাচ্ছে। নজরুলও 'বাঙালী পল্টন'এ নাম লিখিয়ে একদিন করাচী চলে গেলেন।

করাচীতে যে পল্টনের দলে নজরুল স্থান পেলেন সেই দলে একজন ফার্সী জানা মৌলভী ছিলেন। তাঁর সাহায্যে নজরুল ভাল ভাল ফার্সী কবিতার বই, বিশেষ করে হাফেজের বইগুলি পড়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় দিতে লাগলেন তার প্রতিরূপ—"

আগেই বলা হয়েছে যে, নজরুল ইসলামের পিতা ফকির আহমদ সাহেব ছিলেন ধর্মভীরু মানুষ।

দরগাহে খাদেমগিরি করে মসজিদে ইমামতী করে আর ভক্ত-জনদের বাড়িতে মিলাদ শরীফ পাঠ করে সামান্য যা কিছু পেতেন, তাই দিয়ে স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যার ভরণপোষণ করতেন তিনি। এ ছাড়া দলিল-দস্তাবেজ লিখেও তিনি কিছু রোজগার করতেন।

পিতার দরিদ্রতার জন্যে নজরুল উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। ফকির আহমদ সাহেব যখন লোকান্তরিত হন, নজরুল তখন আট বছরের বালক। তবু সেই বয়সেই মা-ভাই-বোনদের বাঁচিয়ে রাখার স্বাভাবিক প্রেরণায় আসানসোলে একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়েছিলেন।

তাঁর মতো অল্পশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ আর অপরিণত বয়স্ক কিশোরের কাজই বা কি আর মাইনেই বা কত! তবু অনটনের সংসারে একেবারে অনাহারে দিন না কাটিয়ে অর্ধাশন তো জুটবে! এই আশাতেই কাজটা যোগাড় করেছিলেন নজরুল। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে ও চাকরি করতে দিলেন না।

এত অভাব, এত কষ্ট—তবু নজরুলের পড়াশোনা বন্ধ হতে দেন নি জাহিদা বিবি। তিনি যে কি অভাবে ছেলেকে তখনও গ্রামের মক্তবে পড়িয়ে চলেছিলেন তা ভাবলে রীতিমত আশ্চর্য হতে হয়।

নজরুলের লেখাপড়ার প্রথম ধাপ শুরু হয় তাঁর বাবার কাছে। বাবাই ছিলেন তাঁর সর্বপ্রথম শিক্ষাগুরু। তারপর অক্ষর পরিচয় শেষ হলে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় গ্রামের মক্তবে।

মক্তবের শিক্ষক ছিলেন মৌলভী কাজী বজলে আহমদ সাহেব। উর্দু আর বাংলা ভাষার তাঁর চমৎকার ব্যুৎপত্তি ছিল। বাংলা বানান শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নজরুলকে তিনি আরবীও শেখাতে থাকেন।

খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন নজরুল ইসলাম। মক্তবের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগেই তিনি বেশ সাবলীলভাবে আর নির্ভুল উচ্চারণে 'কোরাণ শরীক' পাঠ করতে পারতেন। বছর দুই পরে নজরুল ইসলাম মক্তব থেকে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু ছেলেকে হাইস্কুলে পড়াবার যে দুর্বার বাসনা ছিল জননী জাহিদা বিবির অন্তরে, তা ব্যর্থ হয়ে গেল কঠোর দারিদ্র্যের জন্যে।

এদিকে অর্থাভাব তখন চরমে উঠেছে। বাড়িসুদ্ধ সবাইকে প্রায় অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। এই অবস্থা দেখে কিশোর নজরুলকে চাকরির সন্ধানে বেরুতে হলো। অবশেষে চাকরিও একটা জুটে গেল। যে মক্তব হতে নজরুল পাশ করে বেরিয়েছেন সেই মক্তবেই গুরুগিরির চাকরি জুটলো তাঁর। নজরুল ইসলাম হলেন সেই মক্তবের মৌলভী সাহেব।

মাইনে যেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তেমনি নিয়মিতও নয়। তবে নিয়মিত যা পাওয়া যেতো, তা হলো ছাত্রদের বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দেওয়া সিদে—অর্থাৎ কিছু চাল-ডাল-কলা-মূলো-বেগুন-কাঁচকলার ডালি। সিদের পরিমাণ অবশ্য বেশী হবার কথা নয়—কারণ ছাত্রসংখ্যা ছিল নগণ্য, তার ওপর সকলের বাড়ির অবস্থাও সমান নয়। তবু মন্দের ভাল হিসাবেই জাহিদা বিবি এটাকে মেনে নিলেন। আর না মেনে উপায়ই বা কি?

শুধু পাঠশালার গুরুগিরিই নয়, সেই সঙ্গে আরও একটি সম্মানের কাজ জুটে গেল নজরুলের। কাজটি হলো স্থানীয় মসজিদের ইমাম আর মোয়াজ্জীনের পদ। কিন্তু পদটি যত গুরুতর, পদাধিকারী লোকটি কিন্তু তত হালকা; কারণ নবীন ইমাম আর মোয়াজ্জীনের বয়স তখন সবেমাত্র এগারো বছর। চুরুলিয়া গ্রামের ইতিহাসে—সম্ভবত সারা মুসলীম জাহানের ইতিহাসে কোন মসজিদে এত অল্প-বয়স্ক ইমাম এই প্রথম।

নজরুলের এক দূর-সম্পর্কের চাচা ছিলেন। তাঁর নাম মুন্সী বজলে করিম। এই চাচার কাছে ইসলামের সবক নিতে গিয়ে নজরুল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, চাচা সাহেব বাংলা গান ও উর্দু গজল লেখেন। শুধু লেখেনই না, তাতে সুর দিয়ে গুনগুন করে গেয়েও থাকেন।

তাঁর সেই কবিতা আর সুরের ঝঙ্কার নজরুলের হৃদয়কে নাড়া দিল। তাঁর মনের পাপিয়া, বুলবুল আর দোয়েল শ্যামারা চঞ্চল হয়ে উঠলো সেই ছন্দের আঘাতে। চাচার দেখাদেখি তিনিও তখন লিখতে শুরু করলেন গজল।

নজরুলের সে সময়কার লেখা একটি গজলের নমুনা নিচে দেওয়া হলো ঃ

"নমাজ পড়ো মিঞা ওগো নমাজ পড়ো মিঞা,<br>
সবার সাথে জমায়েতে মসজিদেতে গিয়া<br>
তাতে যে নেকী পাবে বেশী<br>
পর সে হবে খেশী<br>
থাকবে নাকো কীনা, প্রেমে পূর্ণ হিয়া॥"

এদিকে সংসারের অভাব তখন সমানেই চলছে। নজরুল যে সামান্য আয় করেন তাতে সকলের খাওয়া-পরা চলে না।

খিদের জ্বালায় ছোট ভাই আলি হোসেন আর কচি বোন কুলসম যখন অবুঝের মতো কাঁদতো তখন মায়ের কাতর ও অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইতো নজরুলের।

ক্ষুধার্ত ভাই-বোনের কাতরানি, অসহায়া মায়ের চোখের জল এবং নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে নজরুলের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি তাই রুজিরোজগারের জন্যে অন্য কোন পথের সন্ধান করতে লাগলেন।

যে সময়ে চুরুলিয়া এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে 'লেটো' গান

খুব জনপ্রিয় ছিল। অনেকটা যাত্রার দলের পালা গানের মতই ছিল লেটো গান। নজরুল একটা গান লিখে লেটোর দলের প্রধানকে পড়তে দিলেন। গানটি পড়ে তাঁর খুবই পছন্দ হলো। তিনি বললেন— এ গান চলবে। তুমি আরও লেখো। আমি পয়সা দিয়ে তোমার লেখা গানগুলো কিনে নেব।

নজরুল তখন শুরু করলেন গান লেখা। এবং কয়েক দিনের মধ্যেই অনেকগুলো গান লিখে দিলেন 'লেটো' পালার জন্যে। দলের কর্তা গানগুলো নিয়ে কয়েকটা টাকা দিলেন নজরুলকে।

গান লিখে টাকা রোজগার করা যায় দেখে নজরুল ইমামতী ছেড়ে দিয়ে লেটোর দলে যোগ দিলেন। এতে তাঁর পেটের ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষিতভাবে মিটলো না সত্য, তবে মনের ক্ষুধা পরিপূর্ণভাবেই মিটলো। তার শুকিয়ে-আসা প্রাণতরু আবার রঙে রসে আর রূপে সজীব হয়ে উঠলো। কিছুদিনের মধ্যেই নজরুল ইসলাম আবার প্রাণবন্ত কিশোর হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখে দেখা দিল হাসি, প্রাণে জেগে উঠলো কবিতা—যে কবিতা গান হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো তাঁর সুধাকণ্ঠ থেকে। বাংলার বুলবুল মাতিয়ে তুললেন কবিতা আর গানের গুল-বাগিচা।

এর পর কিভাবে তিনি ময়মনসিং জেলায় গিয়ে পড়াশুনা করেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে সিয়ারসোল স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে 'বাঙালী পল্টন'-এ যোগ দেন সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বাঙালী পল্টনে নজরুল প্রথমে ঢোকেন সিপাই হয়ে। পরে তাঁর পদোন্নতি হয়ে তিনি হন হাবিলদার।

## ।। সৈনিক হলেন কবি ।।

বাঙালী পল্টন ভেঙে যাবার পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল যখন কলকাতায় এলেন তার কিছুদিন আগে থাকতেই 'সওগাত' ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে সমিতির পত্রিকায় ছোট গল্পের ধরনে তাঁর কয়েকটি লেখা বেরিয়েছিল। সেই লেখাগুলো তখন বেশী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ; কারণ ঐ সব পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কিন্তু যাদের চোখে পড়েছিল তাঁদের বেশ একটু চমক লেগেছিল। লেখাগুলো যে খুব পাকা ছিল না সে সম্বন্ধে তাঁদের বুঝিয়ে বলার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। তাঁদের চমক লেগেছিল এই জন্যে যে, লেখাগুলোয় বিজ্ঞতার অভাব থাকলেও সেগুলো প্রাণ-সম্পদে ভরপুর ছিল।

নজরুল যখন কলকাতায় এলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। গড়ন নাতিদীর্ঘ কিন্তু সুঠাম। তাছাড়া চোখ দুটি কিছু বেশী চঞ্চল ও উজ্জ্বল—স্নেহ মমতা কাড়বার অপূর্ব যাদু ছিল সে চোখ দুটিতে। কণ্ঠে তাঁর অজস্র গান, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গান, আর কারণে-আকরণে প্রাণখোলা উচ্চ হাসি। এই প্রাণ-চাঞ্চল্যের জন্যেই নজরুল জনপ্রিয় হয়েছিলেন অতি অল্প দিনে।

অচিরে কবিতা রচনায় মন দিলেন তিনি। তখন কারোরই জানা ছিল না, উর্দু ও বাংলা পদ মিশানো কবিতা রচনায় অল্প বয়সেই তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন। করাচী সেনানীবাসেই এ ব্যাপারে তাঁর হাতে-খড়ি হয়েছিল। এবং সেখানে থাকতেই তিনি উর্দু আর বাংলা শব্দ মিশিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। হাফিজের কবিতার কিছু কিছু অনুবাদও তিনি এ-সময়ে করেন। দেশে এই সময়ে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। সে আন্দোলনের তীব্রতা যতই বেড়ে

চললো, নজরুলের রচনা-শক্তিও ততই উৎকর্ষ লাভ হতে লাগলো। তাঁর যে কবিতাটি সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে খ্যাতি লাভ করলো, সেটির নাম 'সাত্-ইল্-আরব'। ১৩২৭ সালে জ্যৈষ্ঠের 'মোসলেম ভারত'-পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। স্বর্গত বিনয় সরকার মহাশয় (তিনি বোধ হয় তখন ইউরোপে ছিলেন) ওই কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কবিতাটির একটি স্তবক এই রকম:

"তুষমন্-লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিলমিল,
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিশুারীর!
জিন্দা বীর
'জুলফিকার' আর হায়দারী হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর
সাতিল-আরব! সাতিল আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমায় তীর।"

কোন কিছুকে প্রবলভাবে ভালবাসার বা ঘৃণা করবার কাল যৌবন। অত্যাচারীর প্রতি নবীন কবির সেই প্রবল সহজ ঘৃণা অদ্ভুত রূপ পেয়েছে এর ক'টি ছত্রে।

এর পর তাঁর যে কবিতাটি ব্যাপক প্রশংসা লাভ করলো সেটি হলো 'খেয়া পারের তরণী'। এই কবিতাটি শ্রাবণের 'মোসলেম ভারত'-এ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রেরই ভাদ্র সংখ্যায় মোহিতলাল মজুমদার নজরুলের উচ্চ প্রশংসা করেন। 'মোসলেম ভারত'-এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'কোরবাণী' কবিতাটিও জনপ্রিয় হলো; কিন্তু উক্ত পত্রের আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত কবির 'মহর্‌রম' কবিতাটি বেদনায়, গভীরতায় আর ছন্দ ও মিল-এর অপূর্ব চাতুর্যে বাংলার রসিক সমাজের চিত্ত একেবারে জয় করে নিল। এর প্রথম দুটি স্তবক হলো:

"নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,—
'আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া'

কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে !
রুদ্র মাতন উঠে দুনিয়া—দামেশ্‌কে—
'জয়নালে পরালে এ খুনিয়ার বেশকে ?
'হায় হায় ,হোসেন' ঐ রোল ওঠে ঝঞ্ঝায়,
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদের পাঞ্জায় ?"

লক্ষ্য করার আছে 'খেয়া পারের তরণী'-র ও 'মহর্‌রম'-এর রূপ কল্পনায় মুসলমান সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার রদবদল করতে তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেননি। শুধু তাঁর ভাবাবেগের গাঢ়তা ও অপূর্ব শব্দ যোজনা-সামর্থ তাঁকে এমন অভাবনীয় সাফল্য দান করেছে। 'মহর্‌রম' কবিতাটি এক অতিশয় শক্তিশালী মর্সিয়াগীতি, তার সঙ্গে তাতে প্রকাশ পেয়েছ সেই সময়কার খেলাফত্ আন্দোলনের যুগের মুসমমানের দিগ্‌ভ্রান্ত মানসিকতা। এই অধুনা-পরিত্যক্ত শেষ দুটি চরণ লক্ষ্যণীয় ঃ

"দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম।
লোহু লাও নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম ॥"

এই তিনটি কবিতা পড়ে বাংলার রসিক সমাজ সেদিন যেরূপ অকৃত্রিম অনুরাগে নজরুলের শিরে কবি-যশের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব বেশী নেই। এই সমঝদারির পরিচয় দিয়ে বাংলার রসিক সমাজ সেদিন অবিবেচনার পরিচয় দেননি। এই তিনটি কবিতায় বাস্তবিকই রয়েছে নজরুল-প্রতিভার এক বিশিষ্ট পরিচয়—অপূর্ব বীর্যবন্ত তরুণ কবির শিল্প-প্রতিভার প্রথম পরিচয় যা পরবর্তীকালে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার মহত্তর পরিচয়ের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে।

## ॥ কবি কেন বিদ্রোহী হলেন ॥

নজরুলের বহুমুখী প্রতিভা এবং তাঁর জীবনের বিভিন্নমুখী ঘটনা-বলীর পরিচয় দিতে গেলে বিরাট সাইজের বই লিখতে হয়। আমরা তাই কবির জীবনের কয়েকটি মাত্র মোড় সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

নজরুল অনেক কবিতা ও গান লিখেছেন।

শিশুদের জন্যে তিনি লিখেছেন ঃ

"ভোর হলো দোর খোলো, খুকুমণি ওঠরে"
ঐ ডাকে জুঁই শাখে ফুল খুকি ছোটে রে,
খুকুমণি ওঠো রে!
রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান গায় গান শোনো ঐ 'রামা হৈ'।"

আবার—

"কাঠবিড়ালী' কাঠবিড়ালী, পেয়ারা তুমি খাও?
গুড় মুড়ি খাও? দুধ ভাত খাও? বাতাপি নেবু? লাউ?
বিড়াল বাচ্চা? কুকুরছানা? তাও?"

আরও আছে—

"বাবুদের তালপুকুরে,
হাবুদের ডাল কুকুরে,
সে কি ব্যস করল তাড়া,
বলি থাম্ একটু দাঁড়া—"

এই বলে, কুকুরের তাড়া খাওয়ার যে কাহিনীটি তিনি বর্ণনা করেছেন অনবদ্য কবিতার মাধ্যমে তার কোন তুলনা নেই।

আবার একই লেখনীতে রচিত আছে বিচিত্র স্বাদের'গজল গান।'

"বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল।"

এবং—

"আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায়, কে গো দরদী"।

আবার—

"ভুলি কেমনে, আজি যে মনে,
বেদনা সনে রয়েছে আঁকা।"

এছাড়া আরও যে কত গান তিনি রচনা করেছেন তার কোন লেখাজোখা নেই।

কিন্তু নজরুলকে আমরা শিশুদের কবি বা গীতিকার না বলে বিদ্রোহী কবি বলি কেন, সেই কথাটাই এখানে আলোচনা করতে চাই।

আগেই বলেছি যে, সৈনিক-জীবনের পরে নজরুল যখন কবিতা লিখতে শুরু করলেন, দেশে তখন 'খিলাফৎ আন্দোলন' এবং 'অসহযোগ আন্দোলন' চলছে। এই দুটি আন্দোলনের ঢেউ এসে কবির মনেও আঘাত করে। ক্রমশঃ ইংরেজ সরকারের অত্যাচার আর অবিচারের ঘটনাগুলো তাঁর মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সুশীল সেনকে বেত্রদণ্ড দান, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান, সত্যেন আর কানাইলালের ফাঁসি প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কবির মন বিষিয়ে ওঠে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। এছাড়া সমাজপতি সেজে যারা অসামাজিক কাজ করে চলেছে এবং ধর্মের ভান করে যারা অধর্ম করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধেও নজরুলের মনটা বিষিয়ে ওঠে।

তিনি তাই তাঁর রচনা শক্তিকে নতুন পথে ঘুরিয়ে দেন। এবং সে পথ হলো বিদ্রোহের পথ।

এর পর থেকেই আমরা নজরুলকে দেখতে পাই এক নতুন রূপে—বিদ্রোহী কবি হিসেবে।

তাই নজরুলের শিশু-কবিতা, ধর্মের কবিতা, গজল এবং আরও নানা রকম গানকে ছাড়িয়ে প্রাধান্য পায় তাঁর বিদ্রোহের সুরে রচিত কবিতাগুলি। এবং এই কারণেই কবি নজরুল ইসলাম আখ্যাত হন বিদ্রোহী কবিরূপে।

## ॥ নজরুলের কবিতায় সাম্যবাদ ॥

আগেই বলেছি যে, অত্যাচার অবিচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। যেখানে অত্যাচার সেখানেই কবির বীণা-ধ্বনি রূপান্তরিত হয়েছে অগ্নি-বীণার বজ্র-ঝঙ্কারে ; যেখানে অবিচার সেখানেই কবির বজ্র-লেখনী গর্জন করে উঠেছে ; যেখানে অন্যায়, সেখানেই কবি-কণ্ঠ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে।

সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধেও কবি ছিলেন সোচ্চার। তিনি মনে-প্রাণে আশা পোষণ করতেন যে, দেশে এমন এক শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে, যে সমাজ-ব্যবস্থায় দেশের দরিদ্র জনসাধারণ শোষক-শ্রেণীর শোষণ হতে মুক্ত হয়ে মানুষের মত জীবনযাপন করতে পারবে। রুশ বিপ্লবের প্রভাবেই কবির মনে এই সাম্যবাদী চিন্তাধারা বিকাশলাভ করেছিল। কিভাবে এবং কখন থেকে তাঁর মনে সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রবেশ করে সে সম্বন্ধে কল্পতরু সেনগুপ্ত তাঁর 'নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

> "....নজরুলের 'ব্যাথার দান'-এ লাল ফৌজের ও রুশ বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই সমাজ বিপ্লবী প্রেরণা তিনি সৈনিক জীবনে লাভ করেছিলেন। সৈনিক ব্যারাকে তিনি গোপনে রুশ-বিপ্লবের পত্র-পত্রিকা পাঠ করেছেন এবং অন্যান্যদের পড়িয়েছেন ও আলোচনা করেছেন। ...সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে ( ১৯১৯ সাল খ্রীষ্টাব্দ ) তিনি ভারতে

কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের অন্যতম প্রধান সংগঠক কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে তার বাড়িতে দীর্ঘদিন বাস করতে থাকেন। ···এই সময়ই নজরুলের অধিকাংশ বিখ্যাত্‌ রচনা প্রকাশিত হয়। দুজনে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, এবং গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন।"

এই প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন ঃ

"১৯২১ সালের শেষাশেষিতে আমরা এদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তুলবো স্থির করেছিলাম। কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের পরিকল্পনায় ছিল। রুশ-বিপ্লবের উপরে সে যে, আগে হতে শ্রদ্ধানিত ছিল সে কথা আগেই বলেছি। আমাদের এই পরিকল্পনা হতেই তার সুবিখ্যাত 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা।"

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—প্রলয় নূতন সৃজন বেদন !
আসছে নবীন জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে,
মধুর হেসে !"

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"গাহি সাম্যের গান,
মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই ;
নহে কিছু মহীয়ান !
গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি
ফসলের ফরমান।"
গাহি তাহাদের গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে
যারা আজি আগুয়ান।"

আর একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণীগত ভেদাভেদ কবির মনকে ব্যথিত করেছে। তাই তিনি লিখেছেন ঃ

"নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ, ধর্মজাতি,
সব দেশ সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জাতি।"

শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাণ,
যেন লেখা হয় আমাব রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

কবির মানস নেত্রে ভেসে উঠতো শ্রেণী হীণ, শোষণহীণ এক নতুন সমাজ। তিনি তাই আবেগ-মথিত ভাষায় বচনা করেন ঃ

"আমরা সৃজিত নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান।"

কবি নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তাধারা সম্বন্ধে বিখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ

"নিরন্ন, পদদলিত, শোষিত লোকদেরই নিয়া যে ভারতবর্ষ তাহা পরের যুগের কবির সাহিত্যে আরও পরিস্ফুট হয়। তাই আমরা কবিকে শোষিত সর্বহারাদের প্রতিভূরূপে দেখিতে পাই। কবির বীণায় নূতন ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়। তাই তিনি বলিতেছেন ঃ

"সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।"

এইরূপে তিনি 'কৃষাণের গান', 'ধীবরের গান', 'শ্রমিকের গান', 'সাম্যবাদের গান', 'মানুষের গান' প্রভৃতি গান তখনকার নব-প্রতিষ্ঠিত

'লাঙ্গল' পত্রিকায় প্রকাশিত করেছেন। এই সব গানে তিনি গণ শ্রেণীদের দুঃখের কথা, তাহাদের উপর উচ্চশ্রেণীদের শোষণের কথাও ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সব গানগুলি আজ সারা বাংলার সম্পত্তি হইয়াছে।"

শোষক শ্রেণীর প্রতি কবির ছিল অপরিসীম ঘৃণা। এবং সেই ঘৃণারই বহিস্ফুরণ দেখতে পাই তাঁর সাম্যবাদী কবিতাগুলিতে। পাঠকের অবগতির জন্যে কবির কয়েকটি সাম্যবাদী কবিতা থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"গাহি সাম্যের গান—
এখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলীম ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান।"

'মানুষ' শীর্ষক কবিতায় নজরুল লিখেছেন :

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

'পাপ' শীর্ষক কবিতায় কবি লিখেছেন :

"সাম্যের গান গাই—
যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।
এ পাপ মুলুকে পাপ করেনি কো ঃ কে আছে পুরুষ নারী?
আমরা তো ছার ;—পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারী ;—
আদম হইতে শুরু করে এই নজরুল তক্ সবে
কম বেশী করে পাপের ছুরিতে পুণ্য করেছে যবে?
বিশ্ব পাপস্থান—
অর্ধেক এর ভগবান্, আর অর্ধেক শয়তান।

বারাঙ্গনার প্রতিও কবির মমতা অসীম। তিনি তাদের অশুচি মনে করেননি। তাদের উদ্দেশে কবি লিখেছেন :

"কে তোমারে বলে বারাঙ্গনা, মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে ?
হয়তো তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।
নাই হলে সতী ; তবু তো তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি,
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মতো, তারা আমাদের জ্ঞাতি।"

'নারী' শীর্ষক কবিতায় কবি লিখেছেন :

"সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমনী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

'কুলি-মজুর' শীর্ষক কবিতায় নজরুল লিখেছেন :

"দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব্ তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল ?"

'ফরিয়াদ' কবিতার উপসংহারে কবি বলেছেন :

"এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।
মুক্ত কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান!"

এই তো সত্যিকারের কবিতা। এই তো সত্যিকারের কবি।

## ॥ গীতিকার নজরুল ॥

বিদ্রোহী কবির আর এক পরিচয় হলো 'গীতিকার' ও 'সুরকার'। নিজের লেখা গানে নিজেই সুর আরোপ করতেন নজরুল। আশ্চর্যের কথা এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অমিয়-ধারা যখন তটপ্লাবী নদীজলধারার মত বাংলা দেশকে প্লাবিত করে প্রবাহিত হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ই আর এক নতুন সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো তরুণ কবি নজরুল ইসলামের কণ্ঠে – বনফুল আর বাগানের ফুল চয়ন করে গানের পর গান রচনা করতে লাগলেন গীতিকার নজরুল।

মুকুন্দ দাস গেয়েছিলেন ঃ

"আ ম গান করিতাম গাইতে দিলে গান।
সে গানে মাতিয়ে দিতাম প্রাণ।"

মুকুন্দ দাসের সেই বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে রূপ দিলেন নজরুল। বাংলার প্রতিটি নরনারীর প্রাণ মাতিয়ে দিলেন নজরুল তাঁর অনবদ্য সঙ্গীত-লহরীতে। গান লিখেছেন অনেকেই। এবং সে সব গান গাওয়া হয়েছে বিভিন্ন জলসায়, সঙ্গীতের আসরে এবং জন-জমায়েতে। গ্রামাফোন রেকর্ডেও স্থান পেয়েছে অনেকের লেখা গান। কিন্তু সব গান সর্বশ্রেণীর চিত্ত জয় করতে পারেনি যা পেরেছিল নজরুলের গান।

চাষী যুবক মাঠে লাঙল চালাতে চালাতে গাইছে—"বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল"; বিড়ি-শ্রমিক বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে দুলে দুলে—গাইছে, "কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজালে বনে"; প্রেমিক যুবক গুন্ গুন্ করে গাইছে, "চলে নাগরী কাঁখে গাগরী, চরণ ভারী, কোমর বাঁকা"; স্কুলের ছেলে গাইছে – "চল, চল, চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল্‌রে চল্‌রে চল্! কলেজের ছেলে গাইছে—"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

দেশ প্রেমিক ছেলেমেয়ের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল মারা জীবনের জয়গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলীদান ?

সুরের কী বৈচিত্র্য ! সত্যিই প্রাণ মাতিয়ে তোলে নজরুলের গান আর সে সব গানের সুর ! আজও মনের ভেতরে ভেসে আসে নজরুল গীতির কথা আর সুর—"এত জল ও কাজল চোখে, পাষাণী আনলে বল কে ?" আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী" "নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল !" "কেন আন ফুলডোর আজি এ বিদায় বেলা", "চেয়ো না সুনয়না, আর চেয়ো না ওই নয়নপানে,"

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী তরুণরা সেদিন গেয়েছে—"দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত", অথবা "চলরে কাবার জিয়ারতে, চল্ নাবিজীর দেশ।"

সত্যাগ্রহী দেশপ্রেমিক তরুণ-তরুণীর কণ্ঠে শুনেছি—"কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফ্যাল কর্ রে লোপাট ; রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।"

আবার অন্য সুর, অন্য কথা : "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া !"

হাসির গানেও বৈচিত্র্য এনেছিলেন নজরুল। যেমন :

"মরি হায় হায় হায়
কুবজার কী রূপের বাহার দেখো ;
তারে চিৎ করলে হয় যে ডোঙা
উপুড় করলে সাঁকো।

অথবা-

"কল গাড়ি যায় ভষড় ভষড়
ছ্যাকরা গাড়ি যায় খচাং খচ্,
ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
কুলকুচি দেয় করে ফচ্।

পল্লীগীতিতেও নজরুলের অবদান উল্লেখযোগ্য। যেমন ঃ

"কুচ-বরণ কন্যা রে তার মেঘ বরণ কেশ
আমায় নিয়ে যাও রে নদী সেই কন্যার দেশ।"

কিংবা—

"বন্ধু আজো মনে পড়ে আম কুড়ানো খেলা"

অথবা—

"গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কই?"

মুসলিম সমাজ এবং মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধেও গান রচনা করেছেন নজরুল। যেমন ঃ

"নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনিনু আজান,
শুনি সে তক্‌বীরের ধ্বনি আকুল হলো মনপ্রাণ,
বাহিরে হেরিনু আমি বেহেশ্‌তী রৌশনীতে রে
ছেয়েছে জমীন ও আসমান;
আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশ্‌তা হুর সোলেমান—
এলো কে—কে এলো ভূলোকে
দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে।"

এবং—

"ত্রাণ করমওলা মদিনার—
উম্মত্ তোমার গুনাহ্‌গার কাঁদে
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার
পড়েছে আবার গোনাহের ফাঁদে।"

অথবা—

"নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,—
আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে,

রুদ্র মাতন ওঠে ছুনিয়া—দামেশকে'—
জয়মালে পরালে এ খুনিয়ার বেশ কে?
'হায় হায় হোসেন' ঐ রোল ওঠে ঝঞ্ঝায়
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদের পাতায়।"

এছাড়াও আছে, যেমন—

"তুষমন্ লোহু ঈষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল মিল ;
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে
পীয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর।
জিন্দা বীর
জুলফিকার আর হায়দারী হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর
সাতিল আরব। সাতিল আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার ত'র।"

হিন্দুর দেব-দেবীকে নিয়েও কবিতা ও গান রচনা করেছেন নজরুল। যেমন :

"আর কতকাল থাকবি বেটী
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল!"

এবং

"মা যে আমার কেবল জ্যোতি
সেই পরম শুভ্র জ্যোতির্ধারায়
নিখিল বিশ্ব যায় ডুবে যায়।"

হিন্দুর উপাস্য দেবীকে আর কোন মুসলমান কবি এভাবে 'মা' বলে ডাকেননি। কিন্তু ধর্ম এবং জাতির গণ্ডী দিয়ে নজরুলকে কেউ আলাদা করে রাখতে পারেনি। তিনি ছিলেন সমস্ত গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে। তাই দেশমাতৃকা আর জগজ্জননী ছুর্গাকে তিনি একাকার করে মায়ের আসনে বসিয়ে স্তুতি করেছেন।

গীতিকার নজরুলের কথা বলতে গিয়ে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন ঃ

"অনেকের ধারণা বিদ্রোহী কিংবা যোদ্ধার গলায় প্রেমের কথা ঠিক মানায় না। খুবই ভুল ধারণা। যোদ্ধারাই সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য তার প্রমাণ দেবে।

মাস কয়েক আগেকার কথা। রেডিয়োতে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' অনুষ্ঠানে নজরুল গীতি শুনছিলাম। দু'রকমের গানই সেদিন গাওয়া হল। বীরত্বব্যঞ্জক এমন গান, যা শুনলে কাপুরুষের রক্তেও আগুন ধরে যায়। তার পাশাপাশি এমন মিঠে গজল, যা শুনলে বীরপুরুষের চক্ষুও একটি ললিত স্বপ্নের নেশায় আপনা থেকেই বুজে আসে। এই হল নজরুলের ষোল আনা পরিচয়। আট আনা বিদ্রোহ, আট আনা ভালবাসা।

নীরেনবাবু নিজে কবি, তাই নজরুলের কবিসত্তাকে তিনি সঠিকভাবে ধরতে পেরেছেন। নীরেনবাবুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলছি—নজরুল একাধারে বিদ্রোহী এবং প্রেমিক; দেশপ্রেমিক এবং ভক্ত—তাই তাঁর এক হাতে বজ্রবিষাণ, অন্যহাতে মোহনবাঁশি; এক হাতে তলোয়ার, অন্যহাতে ফুলের মালা।

॥ জীবন-সায়াহ্নে ॥

কবি নজরুলের জীবনে আজ ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যার কালো যবনিকা। কবি আজ আমাদের মধ্যে থেকেও নেই। বাংলার বুলবুল আজ নিস্তব্ধ। বাঙালীর এ যে কতবড় দুঃখ তার তুলনা নেই। আজ আর কেউ কম্বুকণ্ঠে বলে না—"দে গরুর গা ধুইয়ে!"

বাংলার প্রিয় সন্তান নজরুলের স্মৃতিশক্তি আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে। জানি না, আর কোনদিন তা ফিরে আসবে কি না! হয়তো আসবে। যেমন হঠাৎ একদিন তা এসেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। সেদিনের সেই স্মরণীয় মুহূর্তগুলিকে ভাষায় রূপ দিয়ে অমর করে রেখেছেন সাহিত্যিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্যে সুনীলবাবুর সেই রচনাটি এখানে হুবহু তুলে দিলাম।

"—দে গরুর গা ধুইয়ে!

আমি একেবারে সর্বাঙ্গ চমকে উঠলুম। প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে কবি গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে স্বাভাবিক চোখ মেলে তাকালেন। তারপর বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, একি! এতো মালা টালা দিয়ে এমন জবরজং করে সাজিয়েছ কেন আমায়? কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে আমায় বলি দেবে নাকি? এতো বেলা হলো, চা-টাও দেয়নি, ক্ষিদে পেয়ে গেছে। কালী কুল দে মা, নুন দিয়ে খাই, ওরে, চা-টা দিবি নাকি?"

আমার তখন আনন্দ বিস্ময়ে চূড়ান্ত অবস্থা।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এইমাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন, আমারই চোখের সামনে। তাঁর চোখে-মুখে আগেকার সেই বিখ্যাত তেজ ও উজ্জ্বলতা। সারা দেশের লোককে এ সুসংবাদ আমিই প্রথম জানাবো, এই আনন্দে আমারই তখন উন্মাদ হয়ে যাবার মতন অবস্থা।

কবির জ্ঞান ফিরে আসবার পর প্রথম ইণ্টারভিউ ছাপাবার কৃতিত্বও আমার।

কবি এখন হাসিমুখে গলা থেকে মালাগুলো খুলে ফেলেছেন এবং গুন্‌গুন্ করে গান করছেন—বাগিচার বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল!—সেই ভরাট প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর। আমি পকেট থেকে খাতা পেন্সিল বার করছিলুম, তিনি আমাকে এই প্রথম লক্ষ্য করে ধমকে বললেন, "এই ছোঁড়া, তুমি এখানে কি করছো? অ্যাঁ?"

আমি থতমত খেয়ে বললুম, "।কছু না, মানে একটা অটোগ্রাফ নিতে এসেছি, আর যদি ছ'লাইন কবিতা লিখে দেন।"

—"এখন হবে না। যাও ভাগো! অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে গেলো, আবার কবিতা? হবে না, অটোগ্রাফ নেবে তো মেয়েরা, তোমার দরকার কি হে? এখন সময় নেই।"

আমি তবু চুপ করে বসে রইলুম, নজরুল আপন মনেই বললেন —"ইস্, এতো দেরী হয়ে গেলো! নেপেনকে নিয়ে পণ্ডিচেরী যাবার কথা ছিলো, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করবো—'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, "নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা ব∸ছেন?"

—"হ্যাঁ। চেনো নাকি?"

—"আজ্ঞে চিনি। কিন্তু তিনি তো বেঁচে নেই। শ্রীঅরবিন্দও।"

—অ্যাঁ, নেপেন বেঁচে নেই? কি বলো? কবে মরলো? আমি তখন কোথায় ছিলাম?"

কবিব গলায় অসহায় আর্তনাদ ফুটে উঠলো। মানুষকে দুঃখের খবর শোনাবার অভ্যেস আমারও নেই। আমিও খানিকটা অসহায় বোধ করতে লাগলুম। তবু মৃদুস্বরে বললুম, "আপনি একটানা অনেকদিন ঘুমিয়েছিলেন। অ-নে-ক দিন। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে—"

—"হয়েছে? গেছে সাহেব ব্যাটারা? কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙেছে? সত্যি? তাহলে তো ফুর্তি করতে হয় আজ। পণ্ডিচেরী থাক। তাহলে আজ অচিন্ত্য আর প্রেমেনকে ডেকে একবার ঢাকা ঘুরে আসি, ওখানে বুদ্ধদেব আছে।"

আমি বললুম, "বুদ্ধদেব বসু ঢাকা ছেড়েছেন বহুদিন। তাছাড়া, পাকিস্তান…"

—"পাকিস্তান? হক সাহেবের সেই পাকিস্তান? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! জিন্না-গান্ধীজীর ঝগড়া আজও মেটেনি?"

—"ঝগড়া মিটেছে কি না জানি না, তবে ওঁরা কেউই আর ইহলোকে নেই।"

—"নেই? তবে পাকিস্তান কি জন্যে?"

—"পাকিস্তান ওঁরা বেঁচে থাকতেই হয়ে গেছে। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব আর সিন্ধু নিয়ে পাকিস্তান হয়েছে অনেকদিন আগে। গত বছর ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধও হয়ে গেলো।"

—যুদ্ধ হয়ে গেলো মানে? পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা যুদ্ধ করবে? তুমি কে হে ছোকরা? সত্যি করে বলতো? বৃটিশের স্পাই নও তো?"

আমি বিষণ্ণ হেসে বললুম, "পূর্ব বাংলার সঙ্গে আমাদের হাতাহাতি যুদ্ধ হয়নি বটে, কিন্তু এটা একটা আলাদা দেশ। ওখানকার সঙ্গে এখানকার যাতায়াত বন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ, এমনকি বইপত্রের বিনিময়ও বন্ধ। এখানকার বই ওরা পড়তে পায় না, ওদের বইও আমরা পাই না।

—"এরা আর ওরা? তুমি এখান থেকে ভাগো তো! যতো সব মিথ্যে কথা শোনাতে এসেছো। আমি আজকের ট্রেনেই ঢাকা যাবো। দেখি কে আমায় আটকায়! আমি জসিমউদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, প্রেমেন, শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। ওখান থেকে অজিত, পরিমল, মোহিতলালকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো। দেখি কে কি করে? তুমি এখন সরে পড়ো।"

আমি বললুম, "আপনি আমার ওপর অকারণে রাগ করছেন। কিন্তু কথাগুলো সত্যি। আপনি যে ট্রেনে চাপবেন, সে রকম সরাসরি কোন ট্রেনই চলে না আজকাল আর। ওদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগাযোগ সত্যিই একেবারে বন্ধ। আর যাঁদের নাম করছেন তাঁরা অনেকেই দেশ ছেড়েছেন। অবশ্য আপনি যদি যেতে চান তাহলে দুই সরকারের মধ্যে লেখালেখি করে একটা কোন বন্দোবস্ত..."

কবি এবার খানিকটা হতাশ চোখে তাকালেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "এতদিন সত্যিই ঘুমিয়েছিলুম, তুমি শুধু আমায় খারাপ খবর শোনাচ্ছো। ভালো খবর কিছু নেই?"

আমি চিন্তিতভাবে বললুম, "ভালো খবর? হ্যাঁ, মানে, এই তো দুর্গাপুরে বিরাট ইস্পাত কারখানা হয়েছে। কলকাতায় অনেক বড় বড় বাড়ি উঠেছে…"

তাকিয়ে দেখি কবি আবার অবসন্নভাবে হেলান দিয়েছেন। কি সব বিড় বিড় করতে করতে হাত দিয়ে মাথার চুলগুলি ছিঁড়ছেন।"

সুনীলবাবুর চোখের সামনেই কবি আবার হারিয়ে গেলেন। ক্ষণপ্রভার মত যে স্মৃতিরেখা হঠাৎ চমকে উঠেছিল, আবার তা বিলীন হয়ে গেল।

কিন্তু আর কি কোনদিন কবির সে স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবে না? আবার কি হঠাৎ জেগে উঠে তিনি বলবেন না—"দে গরুর গা ধুইয়ে!"

# জীবনানন্দ

॥ জীবনানন্দের কবিসত্ত্বা ॥

রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও যে দু'জন কবি রবীন্দ্র-প্রভাব হতে মুক্ত থেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন, তাঁদের একজন হলেন কবি নজরুল এবং অপরজন হলেন কবি জীবনানন্দ দাশ।

ইতিপূর্বে নজরুলের জীবনকথা লিখতে গিয়ে আমরা তাঁর কবিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এবার জীবনান্দের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলছি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান গ্রন্থটি মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, এবং জীবনানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী হিসেবে লেখা হলেও কবিদের জীবনী, বিশেষ করে সুবিখ্যাত কবিদের জীবনী লিখতে গিয়ে যদি শুধুমাত্র গতানুগতিক ধারায় আলোচ্য ব্যক্তির বংশ-পরিচয়, জন্ম, বাল্যকাল, শিক্ষা এবং কর্ম-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাহলে সে রচনা হবে স্কুলপাঠ্য রচনা বই-এর মনীষীদের জীবনীর মত নীরস। আমাদের মতে কবি ও সাহিত্যিকদের জীবন-কথা লিখতে হলে আলোচ্য কবি অথবা সাহিত্যিকের কবিতা এবং সাহিত্য নিয়েও আলোচনা করা দরকার; কারণ কবি ও সাহিত্যিকদের ব্যক্তিসত্ত্বার সঙ্গে তাঁদের কবিসত্ত্বা এবং সাহিত্যসত্ত্বা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তাই কবির জীবনকথা আলোচনা করতে হলে তাঁর কবিতা সম্বন্ধেও আলোচনা করা দরকার; নইলে কবির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা যায় না।

নজরুলের জীবনী আলোচনার সময় আমরা এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছি। জীবনানন্দের বেলাতেও তাই আগে তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা করছি।

কবি জীবনানন্দ দাশকে বলা হয় আধুনিক কবিতার অগ্রদূত। নতুন সুর এবং নতুনতর আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায় জীবনানন্দের প্রতিটি ক'বতায়। উদাহরণ হিসেবে বাংলা দেশ (অখণ্ড বাংলা দেশ) সম্বন্ধে তাঁর নতুন অনুভূতির উল্লেখ করা যায়। স্নিগ্ধা, শ্যামলা বাংলা মায়ের রূপের তুলনা ছিল না কবির লেখায়। জীবনানন্দের বাংলা তাই 'রূপসী বাংলা'। এই নতুন অনুভূতির ফলেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বাংলা মায়ের সত্যিকারের রূপ। এবং সে রূপকে তিনি প্রকাশ করেছেন স্বকীয় ধারায়। তিনি লিখেছেন ঃ

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি
তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে চাই না আর ;
অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছ
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি—
চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ ঃ
ফনিমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে।"

কী সুন্দর! কী প্রাণবন্ত এই রচনা! পল্লী-বাংলার এই রূপটিই হলো বাংলার আসল রূপ। গগনচুম্বী হর্মমালা-শোভিত শহর-বাংলার শুষ্ক রূপ এটা নয়; এ রূপ হলো শ্যামলা, কোমলা, অপরূপা বাংলা মায়ের স্নিগ্ধ-সুন্দর রূপ।

এই অনুভূতিরই প্রকাশ দেখা যায় জীবনানন্দের আর একটি কবিতায়; তাতে তিনি লিখেছেন ঃ

"আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি, কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মত
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে,

আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে ;
পৃথিবীর কোন পথ এ কন্যারে দেখিনিতো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে।”

বাংলার এই অপরূপ রূপটি কবি দেখেছিলেন নদী-মাতৃক বাংলা দেশের বরিশাল জেলার কোন এক নদীর তীরে ঘাসের ওপর বসে। সন্ধ্যাবেলা স্টীমার, লঞ্চ এবং ছোট ছোট নৌকাগুলি যখন ঢেউয়ের গতিছন্দের সঙ্গে তাল রেখে নদীর বুকে শিহরণ জাগাতো, তখন ঊর্মিমালার নাচন দেখে কবি তন্ময় হয়ে যেতেন। তাকিয়ে থাকতেন অনিমেষ নয়নে বাংলার উদার আকাশের পানে ধ্যানমগ্ন ঋষির মত।

বাংলাকে কবি কতখানি ভালবাসতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় কবিজায়া লাবণ্য দাশের লেখা থেকে। শ্রীমতী দাশ লিখেছেন :

“…বাংলার কবি—বাংলার মাটি, জল, বাংলার স্নেহনীড় ছেড়ে বেশীদিন দূরে থাকতে পারবেন না। পারবেন না তিনি হিজলের অশত্থের সবুজ আভা ছড়ান বন, বেলকুঁড়ি ছাওয়া পথ, স্নিগ্ধ মলয় হিল্লোলিত কাশের বন আর কোকিলের কুহুতান ছেড়ে দূরে থাকতে, তাই তো তিনি সকলকে বার বার আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন :

'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখ বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।'

.... ... ...

হওতো বা হাঁস হবো—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে-ভেসে

আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়।

... ... ...

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে বক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমূলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপসার ঘোলজলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায় ;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—"*

* * *

কবি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। উদার নীল আকাশ, কাশের বন, হিজলের, নারকেলের সবুজ পাতা তাঁকে হাত ইশারায় ডাক দিত। সূর্যের প্রখর আলোকরেখাটি যখন আকাশের বুকে সোনালী রং এঁকে দিত অথবা তাঁর অতি আদরের অজস্র ফুলে ভরা গন্ধরাজ ফুলের গাছটিকে রং-এ ভরিয়ে তুলত, কবি তখন বাগানে একখানি ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় সেই সৌন্দর্যনেশায় বিভোর হয়ে থাকতেন। কখনও বা সুদূর দিগন্তের পানে অবাক দৃষ্টি মেলে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতেন—

রৌদ্র-ঝিলমিল
উষার আকাশ।
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে বারে।

এই সৌন্দর্যের অনুভূতিই নানাভাবে নানা ছন্দে রূপ নিয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। এই অনুভূতির পথ ধরে চলতে চলতেই চিনতে পেরেছিলেন তিনি শ্যামলা, কোমলা, অপরূপ বাংলা মায়ের নিজস্ব রূপটিকে।"

* কবিকে যখন কর্মোপলক্ষ্যে বাংলা দেশের বাইরে যেতে হয়েছিল সেই সময়, অর্থাৎ বাংলা দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার প্রাক্কালে, এই কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন।

কবির এই অনুভূতিকে সঠিকভাবে, চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন কবি-জায়া। এমন সুন্দরভাবে জীবনানন্দের কবিসত্তাকে প্রকাশ করা একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে; কারণ তিনি নিজেকে একেবারে একাকার করে দিয়েছিলেন কবির জীবনের সঙ্গে।

কবিসত্তার আর এক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে রচিত তাঁর একটি কবিতায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী লাবণ্য দাশ লিখেছেন:

"কবির বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতিঘেরা বরিশাল। সেখানে দেখেছেন তিনি হিন্দু-মুসলমানের অপূর্ব ভ্রাতৃরূপ। দুঃখে বিপদে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে—স্নেহ, ভালবাসায় হয়ে উঠেছে অতি আপনজন।...

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্ব-মুহূর্তে একই মায়ের কোলে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি, তাদের সে রক্তের হোলিখেলা বেদনায় মূক করে তুলেছিল কবিচিত্তকে—বিষাদে আচ্ছন্ন করেছিল তাঁর প্রাণ। অন্তরের সে ব্যথা—সে বেদনাকে মুখে প্রকাশ করবার ভাষা তিনি খুঁজে পাননি। তাই লেখনীর সাহায্যে গেঁথে রেখে গেছেন ভাবীকালের সন্তানদের পথ দেখাবার জন্যে—

'প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুজ্জ্বল
ঝর্নার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হয়ে আছে......
মানুষ খেয়েছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হ'য়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূঢ়কে

বধ ক'রে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখে রেখে ....
ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে। 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ, মকবুল, করিম, আজিজ—
আর তুমি? আমার বুকের 'পরে হাত রেখে
মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্ত নদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে, গগন, বিপিন, শশী পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফস্ট্রীটের, এণ্টালীর
কোথাকার কেবা জানে;....
অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে;
কেউ নেই, কিছু নেই - সূর্য নিভে গেছে।"

এই জীবনানন্দ। বাংলার কবি, বাঙালীর কবি জীবনানন্দ। মহৎ, উদার, অতুলনীয় জীবনানন্দ।

* * *

এবার বলছি কবির লেখা ভিন্ন স্বাদের কবিতার কথা। এখানেও শ্রীমতী লাবণ্য দাশের রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। শ্রীমতী দাশ লিখেছেন:

"ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে—এখানকার শোভা সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখবার জন্য, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার জন্যই সে পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু সব কিছুই তার কাছে ব্যর্থ বলে মনে হয় কেন? জীবনকে বোঝা মনে করে তাকে দূরে ফেলে দেবার জন্য কেন সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে?"

এই সব চিন্তা কবির মনে উদিত হয়েছে লাসকাটা ঘর দেখে। বরিশালের সযত্নে, অবহেলায় পড়ে থাকা লাসকাটা ঘর। মানুষের অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে যেন লজ্জানত শিরে নীরবে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিয়ার বুকভরা ভালবাসা, শিশুর অনিন্দ্যসুন্দর হাসি, খ্যাতি, মান, প্রতিপত্তি, জীবনের পরিতৃপ্তি, সবকিছুই হেলায় ঠেলে ফেলে দিয়ে এ-হেন ঘরে গিয়ে যে মানুষ তার বুকের জ্বালা জুড়াতে চায়, দূর করতে চায় তার অবসাদ, অপরিসীম ক্লান্তি —কি তার ব্যথা! কোন্ সে মর্মন্তুদ দুঃখ!

এই চিন্তার প্রতিফলনই দেখতে পাওয়া যায় লাসকাটা ঘরের সম্বন্ধে কবির লেখা বিখ্যাত কবিতায়, যাতে তিনি লিখেছেন ঃ

"শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ ;
বধূ শুয়েছিল পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায় তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত ? ঘুম ভেঙে গেল তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল লাসকাটা ঘরে
শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি ?
কোনদিন জানিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার,
সহিবে না আর—

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ
হেমন্তের বিকেলের
তোমার অসহ্য বোধ হলো ;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে।
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।..."

* * *

জীবনানন্দের কবিতায় আছে ভাবের রঙ। বর্ণ-বিশ্বাসী কবি তিনি। তাই সহজেই তিনি রঙ দেখতে পান। যেমন ঃ

"যেখানে রূপালী জোৎস্না ভিজিতেছে শবের ভিতর,
সেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর ;
যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে খুঁটে খায়
সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায় ;

নির্জন মাছের রঙে সেইখানে হ'য়ে আছ চুপ
পৃথিবীর এক পাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ ;
কান্তারের একপাশে যে নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে শুয়ে দেখিছে কেবল
বিকেলের লাল মেঘ ; নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ; কিন্তু ওই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে ছাখো যদি।
অন্য সব আলো তার অন্ধকার এখানে ফুরালো ;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন ; নীল লাল রূপালী নীরব।”

বর্ণ-অন্বেষী কবির বর্ণ-বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে আরও অনেক কবিতায়। যেমন ঃ

“ভালো বলিয়াছি আমি রাঙা রোদ ক্ষান্ত কার্তিকের মাঠে ঘাসের আঁচলে ফড়িঙের মতো আমি বেড়ায়েছি, দেখেছি কিশোরী এসে হলুদ করবী ছিঁড়ে নেয়—বুকে তার লাল-পেড়ে ভিজে শাড়ি করুণ শঙ্খের মতো ছবি ফুটাতেছে ; ভোরের আকাশখানা রাজহাঁস ভরে গেছে নব কোলাহলে নব নব স্থচনায় ; নদীর গোলাপী ঢেউ কথা বলে—তবু কথা বলে, তবু জানি তার কথা কুয়াশায় ফুরায় না—কেউ যেন শুনিতেছে সবি কোন্ রাঙা শাটিনের মেঘে বসে—

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবনানন্দের কবিতা চিত্ররূপময়। সত্যিই বিচিত্ররূপে, বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র স্বাদে চিত্রিত হয়েছে জীবনানন্দের চিত্ররূপময় কবিতারাজি, যেমন ঃ

“কচি লেবু-পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;

কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নেয়!
আমারো ইচ্ছা করে ওই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।”

আর একটি কবিতায় দেখা যায়ঃ

“বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ···বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাজ্ক্ষায় নেমে আসে;

কিংবা—

“ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে।
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে।”

* * *

এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভে আমরা বলেছি যে, জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্র-যুগের কবি হলেও তাঁর কবিতা রবীন্দ্র-প্রভাব হতে মুক্ত। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রভাব হতে মুক্ত হলেও তাঁর কোন কোন কবিতায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতায় শেক্‌স্‌পীয়র এবং আরও কয়েকজন রোমান্টিক পাশ্চাত্ত্য কবির রচনার ছায়া বেশ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কবির ‘অবসরের গান’ বাঙালী জীবনের সত্যিকারের অবসরের গান। প্রসূতি মাটি, ফলন্ত ধান আর ভিজে শৈশবের গন্ধ দিয়ে ভরা। অথচ, এই স্বল্পস্থায়ী অবসরের অস্পষ্ট সৌন্দর্যচ্ছায়াকে চিত্রবদ্ধ করবার জন্যে কবি মাঝে-মাঝেই সাহায্য নিয়েছেন পরিচিত [illegible],

বিদেশের রীতিনীতি কিংবা প্রচলিত কাহিনীর। এতে অবশ্য কাব্যের রস গাঢ়ই হয়েছে; সমৃদ্ধ হয়েছে কবির বক্তব্য:

"এখানে শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপর মাথা পেতে,
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;"

এই ক্ষেত নিঃসন্দেহে রূপসী বাংলার ক্ষেত,—'রূপ যার শীগগিরই যাবে ঝরে',—'যখনই শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে'। কিন্তু 'মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দে কান ভ'রে 'অবসর পাওয়া কবির মনে বিচিত্র সাধ জাগে:

'গাছের ছায়ার তলে মদ লয়ে কোন্ ভাঁড়
বেঁধেছিল ছড়া!
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া;
ভুলে গিয়ে রাজ্য—জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিলো, তুলে নেবো
তার শীতলতা;
ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁয় মেয়েদের সব;
মাঠের নিস্তব্ধ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের বরফ উৎসব।"

গাছের ছায়ার তলে ছড়া বেঁধেছিল যে ভাঁড়টি, সে শেকস্‌পীয়রের সৃষ্ট জ্যাক ছাড়া আর কে হবে? আর্ডেনের বনে সেই তো ভাগ্য-দেবীর চপলতা নিয়ে মনের দুঃখে গান বেঁধেছিল!

আবার 'অনেক মাটির তলায় চাপা প'ড়ে ঠাণ্ডা হওয়া মদ' নাইটিংগেল-এর গীতমুগ্ধ কীট্‌সের কল্পিত রক্তিম ফেনিল সুরার পাত্রটি ছাড়া আর কী-ই বা মনে পড়িয়ে দেয়।"

[ জীবনানন্দ কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব: ডঃ স্বপ্তি সেন ]

জীবনানন্দকে অনেকে রোমান্টিক কবি বলে থাকেন; কারণ তাঁর কবিতায় রোমান্স ফুটে উঠেছে অনিন্দ্যসুন্দররূপে; যেমন:

"তাই আমি প্রিয়তম ;—প্রিয়া বলে জড়ায়েছি বুক—
ছায়ার মতন আমি হয়েছি তোমার পাশে গিয়া !
যে ধূপ নিভিয়া যায় তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক,—
যে ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমানো গন্ধের মতো স্বপ্ন হয়ে তার ঠোঁটে চুমো দিও, প্রিয়া !"

জীবনানন্দের কবিতায় বাস্তবতাবোধও অতুলনীয় ; যেমন ঃ

"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনারা পরিমাপ নিতে আসে ।"

অথবা—

"ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হয়ে আসে ।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হলো মানুষের বৃত্তি আদায় ।
কেউ যদি কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহ দরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিশ্বের মতন ।"

কিংবা—

"ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হতো
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মায়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে—বিবাহের কিছু পরে সন্তানের
জন্মাবার আগে ।
যে সব সন্তান আজ এ যুগের কু-রাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোক-সমাজের ভীড়ে চাপা পড়ে মৃতপ্রায় ।"

আবার সমাজের নীচু স্তরের সর্বহারাদের প্রীতিও কবির হৃদয় ছিল দরদে ভরা । তাই তিনি লিখেছেন ঃ

"জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব ; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকা-কাটা জিনিসের কেনা-কাটা করে ;"

কিংবা—

"জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে,
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের স্নিগ্ধতীর আছে।"

হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েছে গরীবদের চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু কবি দেখতে পেয়েছেন, হাসপাতালের বেড্ গরীবের জন্যে নয়। তাই তিনি সখেদে লিখেছেন ঃ

"বেড্ আছে বেশী নেই—সকলের প্রয়োজনে নেই।
যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড্ হয়তো তাদের তরে নয়।
বটতলা·মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো আরো
ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত ধরে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলেছে
তাদের আকাশ কোন্ দিকে ?"

আবার যাঁরা আর্ত, নিপীড়িত মানুষের জন্যে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান, কবি তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন ঃ

"যারা এই সব মৃত্যু রোধ করে এক সাহসী পৃথিবী
সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।"

শহরের ফুটপাতে অর্ধ-উলঙ্গ শীর্ণ নরনারীকে ডাস্টবিন থেকে

পচা খাবার কুড়িয়ে খেতে দেখে কবির দরদী হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। তিনি তাই সখেদে লিখেছেন :

"স্বতঃই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসাব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।"

* * *

জীবনানন্দের কাব্য নিয়ে আলোচনা করতে হলে এক বিরাট গ্রন্থ ফেঁদে বসতে হয় ; কিন্তু এই স্বল্পায়তন গ্রন্থে কবির কাব্য নিয়ে পূর্ণ আলোচনা করবার মত সুযোগ না থাকায় আমরা এখানে বুদ্ধদেব বসুর লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গের সমাপ্তিরেখা টানছি।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে' নামক প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন :

"বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ( জীবনানন্দের ) আসনটি ঠিক কোথায় সে বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়। তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে ; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথমবার জীবনানন্দের স্বাতন্ত্র্যময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাততঃ আমাদের পক্ষে এই কথাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য যে, 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধি'র মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি

'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণ স্বরূপ।"

জীবনানন্দের কবি-সত্তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এবার তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

॥ বংশ-পরিচয় ॥

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ জীবনানন্দ দাশ আজ বাংলার কাব্য-জগতে একটি বহু-আলোচিত নাম। বাংলার শিক্ষিত সমাজে জীবনানন্দ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কবিতা পড়েননি একথা যদি কেউ বলেন তাহলে তিনি হবেন উপহাসের পাত্র। এ হেন কবির জীবনকথা জানবার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত সমাজ আগ্রহান্বিত। আমরা তাই এখানে কবির জীবন-কথা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

কবির প্রপিতামহ বলরাম দাশের (দাশগুপ্তর) পৈত্রিক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলের গাইপাড়া গ্রামে। গ্রামটি পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলে দাশ-পরিবারের বাড়িটি পদ্মার ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর পর বলরামের পুত্রেরা বরিশালে এসে ঘর বাঁধেন এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার সময় পর্যন্ত সেখানেই বাস করেন।

বলরাম দাশের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ তারিণীচরণ, মধ্যম ভোলানাথ এবং কনিষ্ঠ সর্বানন্দ। এই কনিষ্ঠ পুত্র সর্বানন্দই হলেন কবির পিতামহ।

সর্বানন্দ দাশের সাত পুত্র ও চার কন্যা। পুত্রেরা হলেন—

হরিচরণ, সত্যানন্দ, যোগানন্দ, অতুলানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও জ্ঞানানন্দ। কন্যারা হলেন প্রিয়ম্বদা, প্রেমদা, বিনোদা এবং স্নেহলতা।

এঁদের মধ্যে বিনোদা বিবাহের আগেই লোকান্তরিতা হন এবং কনিষ্ঠা স্নেহলতা আজীবন কুমারী থেকে দেশের ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। বাকি দুই কন্যার মধ্যে প্রিয়ম্বদার বিবাহ হয় পাঞ্জাব-প্রবাসী ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে এবং প্রেমদার বিবাহ হয় কোটালীপাড়ার মনোমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে।

এবার পুত্রদের কথা বলছি। সর্বানন্দের সাত পুত্রের মধ্যে জ্ঞানানন্দ অবিবাহিত থাকেন এবং বাকি ছয় পুত্র বিবাহ করে সংসারী হন। হরিচরণের স্ত্রী সুশীলাবালা, সত্যানন্দর স্ত্রী কুসুমকুমারী, যোগানন্দের স্ত্রী প্রসন্নকুমারী, প্রেমানন্দের স্ত্রী সুপ্রভা এবং অতুলানন্দের স্ত্রী সরযূবালা।

এঁদের মধ্যে সত্যানন্দ এবং কুসুমকুমারীই হলেন কবির পিতা-মাতা। কুসুমকুমারী গৈলা গ্রামের চন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর জ্যেষ্ঠা কন্যা। কবি হিসেবেও ইনি ছিলেন সুপরিচিতা। তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত কবিতায় দুটি লাইন হলো:

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।"

এই পিতামাতার স্নেহচ্ছায়াতলেই বর্ধিত হয়েছেন কবি জীবনানন্দ দাশ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কবির পিতামহ সর্বানন্দ দাশ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, বন্ধুবৎসল এবং পরহিতব্রতী। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পরে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে প্রচারকের কাজ নেন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হবার ফলে সে-আমলের অনেক মনীষী ব্যক্তির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং অনেক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তাঁর গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, কলিকাতার দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন দাশ এবং বিখ্যাত মনীষী ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম স্তম্ভ শিবনাথ শাস্ত্রী। এছাড়া আরও বহু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হয়।

সর্বানন্দ যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর দুই পুত্র (হরিচরণ ও সত্যানন্দ) জন্মগ্রহণ করেছেন। পরে আরও পাঁচ পুত্র এবং চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, সর্বানন্দ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি তাঁর হিন্দু আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি। তাছাড়া হিন্দু সমাজের আত্মীয়দের সান্ত্বনার জন্যে সর্বানন্দ তাঁর জেষ্ঠ পুত্র হরিচরণকে হিন্দু সমাজের মধ্যেই রেখে দেন।

হরিচরণ এবং সত্যানন্দ প্রথমে বরিশালের জেলা স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। পরে ওঁরা কলিকাতায় এসে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। হরিচরণ থাকতেন কলকাতার একটি মেসে এবং সত্যানন্দ থাকতেন ভবানীপুরের স্বনামধন্য দুর্গামোহন দাশের বাড়িতে।

সত্যানন্দ আলাদা থাকলেও প্রায়ই দাদার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর মেসে যেতেন। সেখানেই একদিন ডাকযোগে পিতার মৃত্যু সংবাদ আসে। সংবাদটি পড়ে দুই ভাই তখন একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়েন। সত্যানন্দ ছুটে যান তাঁর পিতৃবন্ধুদের কাছে। তাঁরা অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন সর্বানন্দ দাশের বিপন্ন পরিবারের সাহায্যে। শোনা যায় যে, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী সে সময় তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

পিতৃবিয়োগের পরে শোকার্ত ভ্রাতৃদ্বয় চলে গেলেন বরিশালের পৈত্রিক বাড়িতে। সেই সময় সর্বানন্দের বন্ধুগণ (দুর্গামোহন দাশ, রাখালচন্দ্র, জগৎচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র এবং স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত) সর্বানন্দের পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

তবে পিতৃবন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেলেও হরিচরণ এবং সত্যানন্দের লেখাপড়ায় ইতি হয়ে গেল। শুরু হলো জীবন-সংগ্রাম। হরিচরণ পোস্ট অফিসে চাকরি নিলেন এবং সত্যানন্দ হবিগঞ্জের একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন। এর পর দুর্গামোহন দাশের চেষ্টায় সত্যানন্দ বাংলা সরকারের অধীনে একটি চাকরি পান; কিন্তু সে চাকরিতে তিনি বেশি দিন থাকতে পারেননি। সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করে আবার তিনি শুরু করেন শিক্ষকতা। এইভাবে এক ভাই পোস্ট অফিসে চাকরি করে এবং অপর ভাই ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা এবং প্রাইভেট টিউশানি করে অতি কষ্টে সংসার চালাতে লাগলেন।

এদিকে বিপদের ওপরে বিপদ। বরিশালের যে বাড়িতে সর্বানন্দ বাস করতেন সে বাড়িটি দাশ পরিবারের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। তাঁদের তখন বাধ্য হয়ে একটা ভাড়াটে বাড়িতে উঠে আসতে হয়।

দাশ পরিবারের সেই বিপদের দিনে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন জগৎচন্দ্র গুপ্তের স্ত্রী মুক্তকেশী গুপ্ত। তিনি তাঁর বসতবাড়ি সংলগ্ন একখণ্ড জমি হরিচরণ ও সত্যানন্দকে দিলেন এবং সেখানে তাদের বাড়ি তৈরি করতে বললেন। বাড়ি তৈরি হতে দেরী হলো না। এর পর তাঁরা ভাড়াটে বাড়ি থেকে আবার উঠে এলেন নিজেদের বাড়িতে।

এই বাড়িটি সম্বন্ধে সত্যানন্দ লিখেছেন: "আমাদের যে নিজ গৃহ থাকিবে না, বাড়ি থাকিবে না, দাদার তাহা সহ্য হইত না। গুপ্ত পরিবারের যে জায়গায় আমাদের দু'তিনখানি গৃহ ছিল তাহা দাদারই একান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের ফল।"

এই বাড়িতে কিছুদিন বাস করবার পর হরিচরণ এবং সত্যানন্দ আর একটি নতুন বাসভবন তৈরি করে সেখানে উঠে যান। এই ভবনের নামকরণ করা হয় 'সর্বানন্দ ভবন'।

পিতৃপরিচয় প্রসঙ্গে জীবনানন্দ বলেছেন: "আমরা শিক্ষা

পেয়েছিলাম তিনজন মানুষের কাছে—একজন হলেন আমাদের বাবা, অপরজন মা, এবং তৃতীয়জন হলেন স্কুলের হেডমাস্টার জগদীশ মুখোপাধ্যায়।…জীবনের যা কিছু কাণ্ডজ্ঞান, মর্মজ্ঞান, রসাস্বাদ বা কিছু লোকসমাজের ঐষণাশক্তি কিংবা নির্জনে ভাবনা প্রতিভা যা কিছু mother writ, যা কিছু সংবাদকে বিদ্যায় পরিণত করতে পারে, বিদ্যাকে জ্ঞানে—সমস্ত জিনিসেরই অন্তর্দীপন ও বিধিনিয়ম এঁদের কাছ থেকে লাভ করবার সুযোগ হয়েছিল আমার।

এবার জীবনানন্দর মাতৃবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করছি। ইতিপূর্বে জীবনানন্দের মাতৃবংশের যে কুলুজী দেখা যায়—তা থেকে জানতে পারা যায় যে, তাঁর মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন চন্দ্রনাথ গুপ্তের দ্বিতীয় সন্তান। চন্দ্রনাথ অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন। তাঁর রচিত হাসির গান একসময় পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে খুবই আদরণীয় ছিল।

মাতা কুসুমকুমারী সম্বন্ধে জীবনানন্দ লিখে গেছেন ঃ

> আমার মা কুসুমকুমারী দাশ বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার বেথুন স্কুলে পড়তেন। খুব সম্ভব ফার্স্ট ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিলেন। তার পরেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। তিনি অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় খুব ভালভাবে পাস করতে পারতেন, এ বিষয়ে সন্তানদের চেয়ে তাঁর বেশি শক্তিই ছিল।…সাহিত্য পড়ায় ও আলোচনায় মাকে বিশেষ অংশ নিতে দেখেছি। দেশী বিদেশী কোন কোন কবি ও ঔপন্যাসিকের কোথায় কি ভালো, কি বিশেষ জিনিস দিয়ে গেছেন তাঁরা, এসবের প্রথমপাঠ তাঁর কাছ থেকেই নিয়েছি। শেলী, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনেক ছোট ছোট কবিতা তাঁর মুখে শুনেছি। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের দেশের কবিতার মোটামুটি ঐতিহ্য জেনে ও বিদেশী কবিদের কাউকে কাউকে মনে রেখে তিনি তাঁর স্বাভাবিক কবি-মনকে, শিক্ষিত

ও স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন।···মা'বেশি লেখার সুযোগ পেলেন না। খুব বড় সংসারের ভিতর এসে পড়েছিলেন যেখানে শিক্ষা ও শিক্ষিতদের আবহাওয়া ছিল বটে কিন্তু দিনরাতের অবিশ্রান্ত কাজের ফাঁকে সময় করে লেখা তখনকার দিনের সেই অসচ্ছল সংসারের একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠল না আর। ····তিনি আরো লিখলে বাংলা সাহিত্যে কিছু দিয়ে যেতে পারতেন।···মার কবিতার আশ্চর্য প্রসাদগুণে অনেক সময়ে বেশ ভালো কবিতা বা গদ্য রচনা করেছেন দেখতে পেতাম। সংসারের নানান কাজকর্মে খুব ব্যস্ত আছেন এমন সময়ে ব্রহ্মবাদীর সম্পাদক আচার্য মনোমোহন চক্রবর্তী এসে 'বললেন—"এক্ষুণি ব্রহ্মবাদীর জন্যে তোমার কবিতা চাই। প্রেসে পাঠাতে হবে। লোক দাঁড়িয়ে আছে।"

—আমার লেখা কোন কবিতা তো নেই এখন!

—লিখে দাও। আমি বসছি।

শুনে মা কলম খাতা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে এক হাতে খুন্তি আর এক হাতে কলম নাড়ছেন দেখা যেত। যেন চিঠি লিখছেন। বড় একটা ঠেকছে না কোথাও। আচার্য চক্রবর্তীকে প্রায় তখনই কবিতা দিয়ে দিলেন। স্বভাব-কবিদের কথা মনে পড়ে আমার। আমাদের দেশের লোক-কবিদের স্বভাবী সহজতাকে। অনেক আগে প্রথম জীবনে মা কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। যেমন, "ছোটনদী দিনরাত বহে কুলকুল," অথবা 'দাদার চিঠি' কিংবা 'বিপাশার পরপারে হাসিমুখে রবি ওঠে'। একটি শান্ত, সুস্মিত ভোরের আলো, শিশির লেগে রয়েছে যেন এসব কবিতার শরীরে। সে দেশ মায়েরই স্বকীয় ভাবনা কল্পনার স্বীয় দেশ। কোনো সময় এসে সেখান থেকে এদের স্থানচ্যুত করতে পারবে না।"

## ॥ শিক্ষা ও বিবাহ ॥

পাঠশালায় শিক্ষা শেষ হলে জীবনানন্দকে ভর্তি করা হয় বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জগদীশ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সত্যিকারের শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। তাই জীবনানন্দের মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে সব রকমে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এই আদর্শ শিক্ষকের অনুপ্রেরণাতেই কবি তাঁর জীবনের উন্নতির সোপানের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই জীবনের অনেকগুলি সোপান অনায়াসে পার হতে পেরেছিলেন।

ব্রজমোহন স্কুল হতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি ভর্তি হন ব্রজমোহন কলেজে। এই কলেজ হতে ফার্ষ্ট ডিভিসানে আই. এ. পাস করে তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। বি. এ. পাস করবার পর তিনি ইংরেজীতে এম. এ. পড়তে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে কবি-জায়া লাবণ্য দাশ লিখেছেন ঃ

> "১৯২১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে এম. এ. পাশ করেন। কবির মুখে শুনেছি—পরীক্ষার কিছুদিন আগে তিনি দারুণ ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ বছর পরীক্ষা দিতে পারবেন না বলে তাঁর মাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধে থাকাতে মায়ের অনুমতি পেলেন না। বাধ্য হলেন পরীক্ষা দিতে—কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সম্মান আর পেলেন না তিনি।

এম. এ. পাশ করার পরে তিনি সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন।

সিটি কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করবার পর তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এই কলেজে অধ্যাপনা করবার সময়ই তাঁর বিবাহ হয়।

এই বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী লাবণ্য দাশ যে সুন্দর বিবরণীটি লিপিবদ্ধ করেছেন, আমরা এখানে তা হুবহু তুলে দিলাম। শ্রীমতী দাশ লিখেছেন ঃ

> "১৯৩০ সনে যখন তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজে ছিলেন, সেই সময়েই আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের ব্যাপারে তাঁর যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল, তার কিছুটা পরিচয় এখানে দিচ্ছি।
>
> আমাকে বিয়ে করবার আগে এক ধনী ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসে। তিনি নিজেই মেয়ে দেখতে গেলেন—সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেসোমশাই (বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) রসরঞ্জন সেন।
>
> পাত্রী পক্ষের আপ্যায়নের ত্রুটি ছিল না। মেসোমশাই তো তাঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ। কবি কিন্তু সব সময় চুপ করেই রইলেন। এমন কি, সালঙ্কারা মেয়েটিকে দেখে এবং তাঁকে বিলেতে পাঠাবার প্রস্তাব শুনেও কোন কথাই বললেন না। বাড়ি ফেরার পরে মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে কিনা সে-কথা বার বার জিগ্যেস করেও কবির কাছ থেকে কোন উত্তরই পাওয়া গেল না।
>
> পরদিন দুপুরে আর একবার যাবার অনুরোধ জানিয়ে পাত্রী পক্ষ গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কবি তখনও যেন চিন্তা করছেন। মেসোমশাই তাঁকে যাবার জন্যে তৈরি হতে বললেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'তুমি যাও, আমি যাব না।'

'সে কি কথা। বিয়ে করবি তুই, আর যাব আমি?' মেসোমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কবি কিন্তু ধীরভাবেই উত্তর দিলেন, 'যেখানে বিয়ে করব না বলেই ঠিক করেছি, সেখানে দ্বিতীয়বার যাওয়াটা আমি অনুচিত বলেই মনে করি।'

সেদিন মেসোমশাই-এর শত অনুরোধও তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

আবার এ ব্যাপারে তিনি যে কতটা উদার ছিলেন তার পরিচয় পেয়েছি আমার বিয়ের সময়। বিয়েতে একটিমাত্র আংটি ছাড়া বোতাম, ঘড়ি অথবা আসবাব কিছুই তাঁকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই আংটিটির জন্যই তিনি কত লজ্জিত, কত কুণ্ঠিত। যেন মহা-অপরাধে অপরাধী। বিয়ের পরে বরিশালে গিয়ে তাঁর বড় পিসীমাকে বলেছিলেন, 'তোমরা যদি বলে দিতে, তাহলে আমি নিজেই একটা আংটি কিনে নিয়ে যেতাম। আমার জন্য লাবণ্যর জ্যেঠামশাইকে শুধু শুধু কতগুলো টাকা ব্যয় করতে হ'ল। তাছাড়া বিয়ে করতে গেলে কিছু-না-কিছু পেতেই হবে—এ নিয়মই বা আছে কেন?'

কবির কথা শুনে বড় পিসীমা হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'সমাজের দোহাই দিচ্ছিস কেন? তোরা না নিলেই পারিস। কিন্তু আমি তো দেখি বিয়ের সময় বেশিরভাগ ছেলে বাপ মায়ের অতি বাধ্য হয়ে 'বাবা মায়ের কথায় উপরে আমি কি কিছু বলতে পারি'—এই কথাই বলে বসে।

কবি তাঁর এই তেজস্বিনী পিসীমাকে ভাল করেই চিনতেন। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয়ঃ মনে করলেন।"

* * *

বিয়ের আগে কনে দেখা বাঙালী হিন্দু সমাজের একটি চিরাচরিত প্রথা। জীবনানন্দের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর এই কনে দেখা প্রসঙ্গে কবি-জায়া শ্রীমতী লাবণ্য দাশের লেখা চমৎকার বিবরণীটি পাঠকদের উপহার দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। শ্রীমতী দাশ লিখেছেন ঃ

"পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আমি তখন সবেমাত্র ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছি। হোস্টেলে থাকি। হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম জ্যেঠামশাই বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছেন।...

আগের দিন বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় কাদা জমেছে। আমি সেই কাদার ভিতর দিয়েই হেঁটে চলেছি। ফলে আমার শাড়ীর পাড় আর জুতোর রং দুয়েরই চেহারা একেবারে অন্য রকম। সেই অবস্থায় বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

মাথায় লম্বা বেণী, কোমরে আঁচল শক্ত করে জড়ান। পায়ে আর শাড়ীর পাড়ে কাদা। আমার দিদি তো আমাকে দেখে হেসেই অস্থির। আমি চটে গিয়ে বললাম, 'হাসি থামিয়ে এখন দয়া করে কিছু খেতে দিয়ে বাধিত কর।'

এমন সময় জ্যেঠামশাই দোতলা থেকে হাঁক দিয়ে বললেন, 'মা লাবণ্য, কয়েকখানা লুচি নিয়ে এস তো!'

দিদি লুচির পাত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েই হাসি চাপতে চাপতে দূরে সরে গেল।' আমিও সেটা নিয়ে দুমদাম শব্দ করতে করতে উপরে চলে গেলাম।

জ্যেঠামশাইকে ঝাঁঝের সঙ্গে কি একটা বলতে যাব, তাকিয়ে দেখি সেখানে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

জ্যেঠামশাই আমাকে বললেন, 'এই যে মা, এস আলাপ

করিয়ে দি। এঁর নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। দিল্লী থেকে এসেছেন। আমার তখন রাগের বদলে হাসির পালা, ছোটবেলা থেকে বেশ ভালভাবেই হাসিটি আয়ত্ত করেছিলাম। হাসি সামলাতে না পেরে ভদ্রলোকের দিকে পিছন ফিরেই একটা টুলের উপর বসে পড়লাম।

জ্যেঠামশাই বার বার বলতে লাগলেন, 'ওকি, পিছন করে বসেছ কেন? ঠিক হয়ে বস। বাড়িতে অতিথি এলে ঠিকভাবে আপ্যায়ন না করাটা খুবই অন্যায়। ইনি তোমাকে কি ভাবছেন?'

'ইনি' নামক ব্যক্তিটি যাই ভাবুন না কেন, ঠিক হয়ে বসব কি—আমি তখন আমার হাসি সামলাতেই ব্যস্ত। যাই হোক, কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আমি তাঁর দিকে ফিরে বসলাম কিন্তু অসীম ধৈর্য ভদ্রলোকটির। যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরলাম, তিনি ঠিক চুপ করেই বসে রইলেন।

তাঁর দিকে ফেরার পরে তিনি আমাকে তিনটি প্রশ্ন করলেন। 'আপনার নাম কি?' 'আই-এ তে কি কি সাবজেক্ট নিয়েছেন?' এবং 'কোন্‌টি আপনার বেশি পছন্দ?'

কোনও মতে প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিয়ে ভদ্রলোককে কিছু না বলেই উঠে নীচে দৌড় দিলাম। রান্নাঘরে ঢুকেই দিদিকে গুম-গুম শব্দে কিল মারতে আরম্ভ করলাম। দিদি আমার হাত দুখানা শক্ত করে ধরে রেখে বলল, 'তোর হ'ল কি?'

আমি আরও রেগে গেলাম। 'আমার কেন হ'তে যাবে? হয়েছে তোমাদের, আজ তোমরা আরম্ভ করেছ কি? ঐ ভদ্রলোকটি কে? আর আমাকে সাত সকালে পাঠাবারই বা মানে কি? দিদি তখন 'আমি কি জানি? ভদ্রলোকটির খবর তো তোরই রাখবার কথা'—বলেই অন্য ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে জ্যেঠামশাই সেই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে

নীচে নেমে বাইরের দিকে চলে গেলেন। আমি তাঁদের দেখেই মুখ ফিরিয়ে বসে রইলাম।

দুপুর বেলা জ্যেঠামশাই আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, লাবণ্য মা, সকালের ভদ্রলোকটিকে তোমার কেমন লাগল?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'উনি এসেছিলেন কেন?' উত্তরে জ্যেঠা-মশাই বললেন, 'তাহলে বলি শোন। উনি দিল্লীর রামযশ কলেজের একজন অধ্যাপক। তোমাকে দেখতে এসেছিলেন।' আমি তখন পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে, বি-এ পাশ না করে বিয়ের কথা ভাববই না।

ছেলেবেলায় মাত্র তিন মাসের তফাতে বাবা মা দু'জনকেই হারিয়েছিলাম বলে আমাদের অকৃতদার জ্যেঠা-মশাই (অমৃতলাল গুপ্ত) তাঁর সবটুকু স্নেহ ঢেলে দু'জনের জায়গাই পূর্ণ করতে চেষ্টা করতেন। তিনি আমাকে অনেক বোঝালেন, তুমি যে বিয়ে করতে চাইছ না, আমি চোখ বুজলে তোমাকে কে দেখবে? তোমার দিদির বিয়ের কথা চলছে। হয়ত শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার ছোট বোনটি খুবই ছোট্ট। তার বিয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং তোমার জন্যই আমার এখন চিন্তা। তাছাড়া উনি তো তোমাকে পড়াতে রাজী আছেন। তাহলে তোমার বিয়েতে আপত্তি করার কি আছে?'

সত্যিই তো! বাবা মা নেই, দিদির বিয়েও ঠিক হচ্ছে; এখন আমার বিয়ে হয়ে গেলেই জ্যেঠামশাই দায়মুক্ত হবেন; অতএব মত আমাকে দিতেই হবে। তবুও শেষবারের মত বললাম, 'ভদ্রলোকের মত না জেনেই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?' তখন জ্যেঠামশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'তিনি সকালে তোমাকে দেখেই মত দিয়েছেন।'

আমার তখন অবাক হবার পালা। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি কত রকমভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে তবে মেয়েকে বর পক্ষীয় লোকের সামনে দাঁড় করাতে হয়। তাঁরা হাজার রকম প্রশ্ন করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করে তবেই মতামত দেন। মেয়েদের সে এক ভীতিজনক অবস্থা। কিন্তু আমার বেলা!

সে যাই হোক, ২৬শে বৈশাখ শুক্রবার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। কবির কবিত্ব-শক্তির কোন রকম পরিচয় তখনও আমরা পাইনি। আমাদের কাছে তিনি অধ্যাপক হিসেবেই পরিচিত হলেন।'

*     *     *

এবার শ্রীমতী লাবণ্য দাশের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় দিচ্ছি। শ্রীমতী দাশের পিতার নাম রোহিণীকুমার গুপ্ত। তিনি ছিলেন খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামের অধিবাসী।

শ্রীমতী লাবণ্যর মায়ের নাম সরযূ গুপ্ত (সেন)। ইনি ছিলেন যশোহর জেলার ইতিনা গ্রামের তারাপ্রসন্ন সেনের একমাত্র সন্তান। লাবণ্যর দিদির নাম প্রমীলা গুপ্ত। বি. এন রেলওয়ের প্রাক্তন কমার্সিয়াল ট্রাফিক ম্যানেজার বসন্তকুমার দে-র সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়। প্রমীলাই ছিলেন রোহিণীবাবুর প্রথম সন্তান এবং লাবণ্য হলেন দ্বিতীয় সন্তান। লাবণ্যর ছোট ভাই শ্রী শান্তিবিন্দু গুপ্ত এবং ছোট বোন নন্দিনী গুপ্ত। শান্তিবিন্দু এখন একটি ব্রিটিশ ফার্মের মাদ্রাজ শাখার ম্যানেজার। নন্দিনীর বিয়ে হয়েছে বার্ন কোম্পানীর ওয়েলফেয়ার অফিসার নিশীথ ঘোষের সঙ্গে।

## ॥ আদর্শ মানুষ ॥

লোকে বলে, কবিরা নাকি আলাদা জগতের মানুষ। সংসারে কি হচ্ছে না-হচ্ছে, কে কি করছে, তার কোন হিসেবই নাকি কবিরা রাখেন না। তাঁরা সব সময় মত্ত থাকেন তাঁদের কবিতার খাতা নিয়ে। কিন্তু কবি জীবনানন্দ ছিলেন এর বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। খ্যাতনামা কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ বন্ধু এবং আদর্শ শিক্ষক। এক কথায় বলা চলে তিনি একজন আদর্শ মানুষ।

চালচলন এবং আচার-ব্যবহারে তিনি ছিলেন একেবারেই সাধারণ মানুষ। কখনো তিনি চিৎকার করে কথা বলতেন না এবং মিলের মোটা ধুতি ছাড়া অন্য কাপড় পরতেন না।

কবি ছিলেন মা-অন্ত প্রাণ। মায়ের স্নেহ-কোমল স্পর্শ না পেলে কোন কিছুই তাঁর ভাল লাগত না।

বাইরে থেকে কবিকে দেখলে মনে হতো, তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু সেই গাম্ভীর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকত তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা। তবে যার-তার সঙ্গে তিনি কৌতুক করতেন না। তাঁর কৌতুকের পাত্র ছিলেন তাঁর দাদু চন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তিনি বাড়িতে এলেই কবির মুখের ওপর থেকে গাম্ভীর্যের ছদ্ম-আবরণ খসে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠত কৌতুকের স্নিগ্ধ হাসি।

একবার দাদু স্নান সেরে কার একখানা শাড়ি পরেছেন। তাঁকে সেই শাড়ি-পড়া অবস্থায় দেখে কবি তাঁর কাছে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন—'কি হে চন্দরনাথ, শাড়ির পাড়ই পছন্দ হইচে? চুল আচড়ানের কাঁকই পাইছ? তোমারে আর কি ত্যাওন যায়—কও!'

কবির কথা শুনে দাদু এক হাতে তাঁর নাতিকে অন্য হাতে নাত্-বৌকে (লাবণ্যকে) জড়িয়ে ধরে সে কালের একটি অতি-পরিচিত হাসির গান গেয়ে শুনালেন। গানটি হলো—

"বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা
ঢাইলা দিছি পায়,
তোমার লগে ক্যামতে পারুম
হইয়া উঠেছে দায়।
আরসি দিচি, কাঁকই দিচি,
চুল বাঁধনের ফিতা দিচি,
আর কি ছ্যাওন যায়?"

কবি যে ছাত্র-দরদী ছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি। ছাত্ররাও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করত। ছাত্রদের তিনি কতখানি ভালবাসতেন সে সম্বন্ধে এখানে ছোট একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। সেদিন ছিল 'হোলি' উৎসব। সকালে একদল ছাত্র বাড়িতে এসে কবির পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করতে লাগল। এই সময় তাদের মধ্যে একজন লাবণ্যর ঘরে ঢুকে তাঁকে বললে—'আপনাকে রঙ দেব।'

আবির দেওয়াটা লাবণ্য একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাই তিনি বেশ একটু রুক্ষকণ্ঠেই বলে দিলেন যে, আবির দেওয়া চলবে না।

কবির বাবা সেই সময় পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি সেই ছেলেটিকে ডেকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢুকবার জন্যে। ছেলেটি অপরাধীর মত মুখ নিচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

ছেলেরা চলে গেলে কবি তাঁর স্ত্রীকে বললেন—'হোলির সময় রঙ দেওয়াটা আমাদের দেশে একটা রীতি। এই দিনে ছাত্ররা

অধ্যাপকদের বাড়িতে গিয়ে আবির দিয়ে সস্ত্রীক তাঁদের শ্রদ্ধা জানায়। তোমাকে ঠিক সেইভাবেই দিতে এসেছিল। স্নান করলেই তো রঙ উঠে যেত। তুমি এত বিরক্ত হলে কেন?'

কবির কথায় সেদিন কবি-জায়া খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন।

আর একদিনের কথা। কবি তখন কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। তখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা চলছে। দাঙ্গাটা প্রথম দিকে মুসলমানরা শুরু করলেও শেষদিকে তারাই মার খাচ্ছিল বেশি। বেগতিক দেখে বাংলার মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট তখন মিলিটারি তলব করলেন মুসলমানদের বাঁচাবার জন্যে। সৈনিকদের বুঝানো হলো যে, হিন্দুরাই দাঙ্গাবাজ এবং ওরাই যত নষ্টের গোড়া। ওদের বেশ ভালোভাবে শায়েস্তা করা দরকার। সৈন্যরা তখন ট্রাকে করে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে শুরু করলো দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের শায়েস্তা করবার জন্যে।

এমনি সময় একদিন কবি ক্রীক রো দিয়ে ফিরছেন, হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, রাস্তার লোকেরা দৌড়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। একটু পরেই একখানা মিলিটারি ট্রাক এসে তাঁর সামনে থামল। ট্রাক থেকে একজন অফিসার নিচে নেমে এসে কবির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—আর ইউ এ হিন্দু?

হতচকিত হয়ে পড়লেন কবি। তবুও সাহসে ভর করে উত্তর দিলেন—ইয়েস।

—আই থিংক্ ইউ আর দ্য রিং লীডার অফ দিস এরিয়া। জাস্ট গেট অন্।

কবি কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে কিছু বলতে না দিয়েই জোর করে ট্রাকে তুলে থানায় নিয়ে গেল। থানার ও. সি. ছিলেন কবির একজন প্রাক্তন ছাত্র। কবিকে দেখে তিনি সসম্ভ্রমে

তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নিজে সঙ্গে করে তাঁকে নিরাপদ এলাকায় নিয়ে এসে ট্রামে চড়িয়ে দিয়ে গেলেন।

বাড়িতে গিয়ে কবি যখন তাঁর প্রাক্তন ছাত্রটির কথা সকলের কাছে বলছিলেন তখন ছাত্রের গর্বে তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

* * *

কবির মেয়ে মঞ্জুশ্রী তখন আই-এ পড়ছে। কবির কবিত্ব শক্তির কিছুটা অংশ সে পেয়েছিল। তাই শৈশব কাল থেকেই সে কবিতা লিখতে শুরু করেছিল। মঞ্জুর সেই সময়কার লেখা একটি কবিতা একটি পত্রিকাতে ছাপাও হয়েছিল।

কবি তাঁর মেয়ের সঙ্গে অনেকটা বন্ধুর মতন ব্যবহার করতেন।

একদিনের একটি ঘটনার কথা বলছি।

লাবণ্য কবির অমতেই মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছিলেন তখন। তাঁর সেই প্রচেষ্টার ফলে একদিন একটি ছেলে মঞ্জুকে দেখতে এলো। ছেলেটি ভাল ঘরের এবং ভাল চাকরি করে।

ছেলেটি এলে লাবণ্য যখন তাকে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলেন, তখন ছেলের চাইতে তার বেশভূষার দিকেই কবির বেশি নজর দেখা গেল।

এদিকে মেয়ের কাণ্ড আরও সাংঘাতিক। সে জানতো না যে, তাকে দেখবার জন্যেই ছেলেটি এসেছে। সে তাই যেন অদ্ভুত কিছু দেখছে এমনিভাবে তাকাতে লাগলো ছেলেটির দিকে।

[illegible] বদায় নিলে লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে কবি জিজ্ঞেস করলেন—একে তুমি যোগাড় করলে কোথা থেকে?

—কেন, ওর দোষটা কি হলো?

—না, দোষ কিছুই হয়নি। তবে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে একে ধুতি পরানো শেখাতে-শেখাতেই মেয়ের জীবন কেটে যাবে। কি বলিস মঞ্জু?

মেয়েও তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো—ও বাবা! এই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে নাকি? যে ভাবে কাপড় পরেছে, আমি তো বাঙালী বলে বুঝতেই পারিনি।

—ঠিক বলেছিস। একটু সাবধানে থাকিস। এর পরে তোর মা আবার কি এনে হাজির করবেন কে জানে!

কবির কথা শুনে লাবণ্য বেশ একটু রাগের সুরে বললেন—খুব হয়েছে! আর বলতে হবে না। কিন্তু মেয়ের বাবা যখন রোহিণী গুপ্তের মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর কোঁচাটা কত লম্বা ছিল শুনি?

কবি তখন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন:

"সে যুগ হয়েছে বাসী,
সে যুগেতে আর এ যুগেতে এবে
তফাৎ অনেক বেশী।"

ব্যক্তি জীবনানন্দের এই হলো সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

## ।। অকালে ঝরিল ফুল ।।

বাংলার সেই প্রিয় কবি আজ আর নেই। অকালেই ঝরে গেছে ফুল। থেমে গেছে বাংলার বুলবুলের কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত। আর কোন দিন তাঁব লেখনী থেকে বের হবে না কোন কবিতা।

আজ বারে বারে মনে পড়ছে কবির সেই কবিতাটি—যাতে তিনি লিখে গেছেন ঃ

"আমার মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে
চাই আর? জানি না কি তাহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো
এসে জাগে,
ধূসব মৃত্যুর মুখ। একদিন পৃথিবীতে
স্বপ্ন ছিলো সোনা ছিলো যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়, যেন কোন্ মায়াবীর
প্রয়োজনে লাগে।"

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কবিতার চারটি লাইন আমার মনে পড়ছে ঃ

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলার
হয়তো মানুষ নয় —হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াসার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।"

সত্যিই কি আবার তুমি আসবে? আবার তুমি বাজাবে তোমার কবিতার বীণা? হায়, কে দেবে এ প্রশ্নের উত্তর।

সব শেষে কবি জায়ার লেখা থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি।

"বাংলা মায়ের যে কয়জন সন্তান বিশ্বের দরবারে মায়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, কবি জীবনানন্দ তাঁদের অন্যতম, যশোলক্ষ্মী যখন জয়-গৌরবের মালা হাতে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন— ঠিক সেই সময়েই হেমন্তের কবি হেমন্তেরই এক কুয়াশা-ঢাকা রাত্রে চিরদিনের মতই হারিয়ে গেলেন— হারিয়ে গেলেন রহস্যময় রাজপুরীর সোপানাবলী ধরে কোন্ এক অন্ধকার গুহাকক্ষে। রঙে-রসে-স্বপ্নে ভরা এই পৃথিবী। চোখে তার মায়ার কাজল।• কিন্তু মহাকালের ডাক যখন আসে, তখন ধরিত্রী মায়ের বুক খালি করে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে আমাদের পড়তেই হবে। আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভালবাসা সবকিছুই মায়াবী মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে অনন্ত চিন্তা-ভাবনার পরিসমাপ্তির রেখা টানতেই হয় "

কবি জীবনানন্দ আজ নেই। কিন্তু মরদেহে বিদ্যমান না থাকলেও তিনি বেঁচে আছেন প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়-মাঝে। মরেও তিনি অমর হয়ে আছেন। এবং অমর হয়েই থাকবেন চিরদিন।

॥ শেষ ॥